বিন্দু-বিসর্গ

"বনফুল"



রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫১
পুনর্মুদ্রণ—শ্রাবণ ১৩৫২

মূল্য দুই টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
১১—২৫. ৭. ৪৫

কথালোক-চিত্রকর

শ্রীপরিমল গোস্বামী

স্মরণ-কমলেষু

২৮. ৩. ৫৪

ভাগলপুর

সূচীপত্র

কবচ

আমার হৃদয় বিগলিত হইতেছে।

কিসে বিগলিত হইতেছে, কেন বিগলিত হইতেছে, কে বিগলিত করিতেছে, তাহা আমি বলিব না। বলিতে পারিব না। বলিতে গেলে আমার হৃদয় আরও বিগলিত হইয়া যাইবে, তখন আর আমি নিজেকে সামলাইতে পারিব না, সম্পূর্ণরূপে বিগলিত হইয়া সব কথা বলিয়া ফেলিব। আমার অবচেতন মনের অন্তরালে যে সকল নিগূঢ় বাণী নিগূঢ়ভাবে চাপা আছে, তাহাদের নিরুদ্ধ উত্তাপ হৃদয়কে বিগলিত করিতে পারে কি পারে না, সে প্রশ্ন অবান্তর। কারণ—

বাতাসা—৶০

পোস্ত—আধ পোয়া

পাঁচ ফোড়ন—এক আনার

জৈত্রি—দুই পয়সার

২

আকাশ দেখিয়াছেন?

যে আকাশ দেখা যায়, যে আকাশ নীল, সে আকাশ নয়। যে আকাশ দেখা যায় না, যাহার বর্ণ অবর্ণনীয়, যাহা কোন স্থানবিশেষের বিস্তৃতি নয়, সেই আকাশ। দেখিয়াছেন? আমার বিশ্বাস, আপনি দেখেন নাই। আমি একদিন দেখিয়াছি, এক মুহূর্তের জন্য অকস্মাৎ দেখিয়াছি। চোখ

খুলিয়া নয়, চোখ বুজিয়া দেখিয়াছি। আমি বুঝিতে পারিতেছি, আপনি প্রশ্নাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। আপনার প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা হইতেছে, সে আকাশ কেমন, কোথায়······না না, পারিব না, বলিতে পারিব না।

এলাচ—এক কাঁচ্চা
ঝোলা গুড়—দুই সের
কুলি বেগুন—আধ সের
সৈন্ধব লবণ—আধ সের
টমাটো—দুই সের
জিরা মরিচ—আধ পোয়া
তেঁতুল —এক সের

৩

কাঁদিয়াছেন কখনও ?

ভেউভেউ করিয়া নয়, হুহু করিয়া নয়, ফোঁসফোঁস করিয়া নয়, গুমরিয়া গুমরিয়া। সে ক্রন্দনে অশ্রু নাই, স্বার্থ নাই, এমন কি বেদনা-বোধও নাই। তাহা শুধু নিছক ক্রন্দন, তাহা কোন বাহ্যিক আঘাতের ফল নয়, তাহা স্বতঃ-উৎসারিত। সমুদ্রের গভীরতার অন্তস্তলে সে ক্রন্দন স্তব্ধ হইয়া আছে, তাহা হাসিরই নামান্তর, তাহা অনাদি রহস্যের অনন্ত আক্ষেপের মত···ও কি !···কিসের ডানা হাওয়ায় উড়িতেছে ?··· প্রজাপতির ?···কিন্তু···না,—

আলু- দুই সের
চাল—আধ মণ
মসুর ডাল—আড়াই সের

দারুচিনি—এক পয়সার
পেঁয়াজ—আধ সের
যব—আধ সের
তিসি—এক সের

৪

আকাশে ঘুড়ি উড়িতেছে। ও ঘুড়ি নয়, মানুষের মন।—

চিনাবাদাম—দুই পয়সার
নারিকেল—একটা
সরিষার তৈল—আধ পোয়া
স্টোভের পোকার—একটা
ছাঁকনি—একটা

৫

মন আকাশে ওড়ে।

কিন্তু উড্ডীয়মান মনের সূত্র লাটাইয়ের পাকে পাকে জড়ানো। লাটাই ওড়ে না, সে মৃত্তিকার, সে সূত্রধারক, সে ওড়ায়। দার্শনিকতার অবতারণা করিতেছি না; কথাটা মনে হইল, তাই বলিলাম। যাহা মনে হয়, তাহা বলার নামই দার্শনিকতা নয়। বস্তুত, যাহা সহজে মনে হয় না, তাহাই মনে পড়াইয়া দেওয়ার নাম দার্শনিকতা। যাহা বহুর মধ্যে এক-আধজন দেখে তাহাই দর্শন, বহুজন যাহাকে দেখে তাহাও একপ্রকার দর্শন, কিন্তু তাহা মহাত্মা-দর্শন—বড় জোর দেব-দর্শন, তত্ত্ব-দর্শন নয়। বিচিত্র!

তত্ত্বটা আছে, কিন্তু সকলে দেখিতে পায় না, দেখিতে পাইলেও তদনুসারে চলিতে পারে না। সংসারে ঝঞ্ঝাট অনেক, এ কথা অনেকেই বোঝেন, কিন্তু বুদ্ধ বা চৈতন্যের মত কয়জন পলাইতে পারিলেন? অনেক দূরে··· বনে···পর্ব্বতে···সুদূর দ্বীপে···সমুদ্রের ঢেউ আসিয়া প্রবালতটে লাগিতেছে—ছলাৎ-ছলাৎ-ছলাৎ···কোথাও যেন বাঁশী বাজিতেছে···না না, পারিব না, পারিব না—

ছোলা—এক সের
আদা—আধ পোয়া
নিমের দাঁতন—এক পয়সার
মকটো—এক বাক্স
শালগম—আধ সের
বাঁধাকপি—একটা

৬

বলিতেছিলাম, আমার হৃদয় বিগলিত হইতেছে। কথাটা বোধ হয় সম্পূর্ণ ভুল। যাহার কাঠিন্য আছে, তাহাই বিগলিত হয়। আমি কোন দিনই কঠিনহৃদয় ছিলাম না। আমি চিরদিনই তরলমতি। যাহা তরল, তাহা আবার বিগলিত হইবে কি প্রকারে? তরল পদার্থ উত্তাপ সংযোগে বাষ্পে পরিণত হয় শুনিয়াছি। তবে কি তাহাই হইল? হৃদয় কি ক্রমশ বাষ্পে পরিণত হইতেছে? বাষ্পে?···বাষ্পের জোরে বেলুন উড়ে, এঞ্জিন ছোটে, জাহাজ চলে। বস্তুত, সমগ্র সভ্যতার মূলে বাষ্প আছে। আমার হৃদয় সেই বাষ্পে পরিণত হইয়াছে? কথাটা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তরল পদার্থে উত্তাপ দিলে বাষ্পই হয়। বাষ্পের

স্বপ্ন দেখিব? বাষ্পীভূত হৃদয়ের ইলেক্‌ট্রন, প্রোটন, পজিট্রন, নিউট্রন! বিচিত্র কক্ষপথে ঘূর্ণ্যমান লক্ষ কামনার বায়বীয় রূপ!…না না, পারিব না, পারিব না, পারিব না—

খেসারির ডাল—আধ সের
বরবটি—এক পোয়া
ঝিঙে—আধ সের
পুঁইশাক—এক পয়সার
কুঁচো চিংড়ি—এক পোয়া
মুড়কি—দুই পয়সার

৭

শিশু হাসে।

অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহার হাসিটি সুমিষ্ট, তাহাও স্বীকার করিব। একদা তাহার হাসির সহিত 'বাঁশী', 'ভালবাসি', 'সুধারাশি' প্রভৃতি মিলাইয়া আমি কবিতা লিখিয়াছি; লিখিয়া সুখও পাইয়াছি। কিন্তু শিশুর সম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রণিধানযোগ্য বক্তব্য আছে, যাহা সকলে জানেন, কিন্তু বলেন না। একটি মাত্র উল্লেখ করিতেছি। শিশু কাঁদে। ক্ষুধার তাড়নায় কাঁদে, অসুখের যন্ত্রণায় কাঁদে, গ্রীষ্মের প্রকোপে কাঁদে, শীতের আধিক্যে কাঁদে, সকারণে কাঁদে, অকারণে কাঁদে। ভয়ানক কাঁদে, অনেক সময় সে কান্না থামানো যায় না। অস্থির হইয়া পড়িতে হয়। অনেক শিশু জীবনে হাসিবার সুযোগই পায় না, কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিয়া যায়। পাড়া ঠাণ্ডা হয়।

ঠাণ্ডা! আমরা ঠাণ্ডা প্রকৃতির, উত্তাপ চাই না, উত্তেজনা চাই না, ঠাণ্ডা চাই।·· ঠাণ্ডা ও শিশু ·একটি স্মৃতি মনে জাগিতেছে। ঠাণ্ডা শীতের রাত্রে, ঠাণ্ডা গঙ্গাজলে নামিয়া একটি মৃত শিশুকে একদা বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম। ছেলেটা বড় কাঁদুনে ছিল, আকাশ বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিত। সে কান্না

ঘুঁটে—চার পয়সার
লাউ—একটা
পটল—এক পোয়া
মাছ-ধোয়া চুপড়ি—একটা
ধূপ—এক বাণ্ডিল
তামাক-পাতা—এক পোয়া
বড়ি—চার পয়সার
তেজপাতা—এক পয়সার
ধনে—এক আনার

৮

অনেকে বলেন, কোন কিছুই হারানো ভাল নয়, এমন কি আত্মহারা হওয়াও অশোভন। কিন্তু তাহাই কি ঠিক? যদি মানুষ আত্মহারা হইতে না পারিত, তাহা হইলে সে কিছুই করিতে পারিত না। আত্ম কথাটার সহিত স্বার্থ কথাটা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইলেও কথা দুইটি একার্থক নয়। আত্মহারা হওয়া মানে স্বার্থহারা হওয়া—ইহা মানিতে গেলে গোলমালে পড়িতে হইবে। আমরা আত্মহারা হই স্বার্থেরই প্রেরণায়। প্রেমে আত্মহারা হই, অধ্যয়নে আত্মহারা হই, ক্রোধে

আত্মহারা হই, বিস্ময়ে আত্মহারা হই, হিংসায় আত্মহারা হই। সকলেরই মূলে একটা না একটা স্বার্থ প্রকট অথবা প্রচ্ছন্ন আছে। যাঁহারা আত্মহারা হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, শুনিয়াছি, তাঁহাদের লক্ষ্য মোক্ষলাভ। যাঁহারা আত্মহারা হইয়া সংসার আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের কি লক্ষ্য, বস্তুত কোন লক্ষ্যকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা সংসার পাতিয়াছেন কি না, তাহা সহজে জানিবার উপায় নাই। আমার সন্দেহ হয়, অধিকাংশ লোক গতানুগতিকতার স্রোতে ভাসিয়া সংসারধর্ম্ম করেন, আত্মহারা হইয়া নয়। আমার মত আত্মহারা হইয়া যদি সংসার করিতে হইত, তাহা হইলে একটা লক্ষ্য ঠিক থাকিত এবং অধিকাংশ লোকেই শেষ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিত যে, যাঁহারা বলেন—কোন কিছুই হারানো ভাল নয়, এমন কি আত্মহারা হওয়াও অশোভন, তাঁহাদের কথা একেবারে মূল্যহীন নয়। আমিও তাঁহাদের এই উক্তিটিকে যথেষ্ট মূল্যবান মনে করি, তথাপি কিন্তু বারংবার মনে হয়, আত্মহারা না হইলে মনুষ্যত্ব বলিয়া কোন কিছু থাকিত কি? প্রথম যৌবনে আত্মহারা হইয়া যখন নীলিমাকে ভালবাসিয়াছিলাম, তখন

কেরোসিন তেল—এক টিন
শাড়ি—দুই জোড়া
ব্লাউজের ছিট—তিন গজ
টুথব্রাশ—একটা
কুমড়োর ফালি—একটা
কাঁকরোল—এক পয়সার
ঢ্যাড়স—এক পোয়া
হলুদ—আড়াই পোয়া
লঙ্কা—এক পোয়া

৯

অবচেতন মনের স্তরে স্তরে অনেক কামনা সুপ্ত আছে। তাহাদের মাঝে মাঝে নিদ্রাভঙ্গ হয়, আমার চলনে বলনে হাসিতে কাসিতে তখন তাহারা আত্মপ্রকাশ করিতে চায়, আপনারা সকলে উৎসুক নয়নে চাহিয়া দেখেন। আপনাদের এই উৎসুক চাহনি আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কিন্তু জানিয়া রাখুন, আমি ধরা দিব না। অন্তরের অন্তস্তলে যে স্বপ্নগুলি গুটি বাঁধিয়া আছে, যেই তাহারা গুটি কাটিয়া প্রজাপতির আকারে বাহির হইয়া আসিতে চায়, আমি অমনই তারস্বরে সেই নামগুলি আবৃত্তি করিতে থাকি, যাহারা আমার জীবনের সমস্ত স্বপ্নকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে—বাতাসা, পোস্ত, পাঁচ ফোড়ন, জৈত্রি, ঝোলা গুড়, এলাচ, কুলি বেগুন, কুঁচো চিংড়ি, চাল, ডাল, শাড়ি, সাবান। আবৃত্তি করিবামাত্র সমস্ত প্রজাপতি আবার গুটি হইয়া যায়। কবচ আবিষ্কার করিয়াছি।

আমার মনের খবর জানিতে পারিবেন না।

পাকা রুই

স্টেশনের পান্থশালায় ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ। লোকটিকে দেখিলে শ্রদ্ধা হয়। পরনে খদ্দরের মোটা কাপড়, গায়ে খদ্দরের মোটা চাদর, একমুখ দাড়ি, একবুক চুল। খালি পা। কথায় কথায় ভণ্ডামির কথা উঠিল।

তিনি হাসিয়া বলিলেন, নিশ্চয়, ভণ্ডামিতেই তো সেরেছে; পরশুরাম বিরিঞ্চি-বাবা এঁকেছেন, ওই হ'ল ভণ্ডামির পার্ফেক্ট টাইপ; কিন্তু একটা কথা কি জানেন, ভণ্ডামি বেশি দিন টেঁকে না। আসল মানুষটাকে শেষ পর্য্যন্ত ধরা দিতেই হয়।

কি রকম?

ভদ্রলোক ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে স্মিত মুখে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, একটা গল্প বলি তা হ'লে, শুনুন।

বলুন।

নীলমাধব ব'লে একজন লোক ছিল। অসাধারণ ব্যক্তি। অর্থাৎ বাইরের নীলমাধবকে দেখে ভেতরের নীলমাধবকে চেনবার উপায় ছিল না। বোঝবার উপায় ছিল না যে, সে ছেলেবেলায় পিতৃমাতৃহীন হয়ে দুর-সম্পর্কের পিসের বাড়িতে মানুষ হয়েছিল; বোঝবার উপায় ছিল না যে, সে আই. এ. ফেল; বোঝবার উপায় ছিল না যে, সে বেকার; বোঝবার উপায় ছিল না যে, ওই পিসের গলগ্রহ থেকেও সে একটা যক্ষ্মাগ্রস্ত মেয়েকে বিয়ে ক'রে তার গর্ভে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে উৎপাদন করেছে। কিছু বোঝবার উপায় ছিল না। লোকের কাছে ধার করবার অসাধারণ শক্তি ছিল তার। সবাই তাকে ধার দিত। নিখুঁত লেফাপার জোরে রঙিন রবারের বেলুনের মত সে সকলের সপ্রশংস

দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে উড়ে বেড়াত। রবারের বেলুনের সঙ্গে উপমা দিচ্ছি বটে, কিন্তু রবারের বেলুনের সঙ্গে তার প্রকাণ্ড একটা অমিল ছিল। রবারের বেলুন বেশিক্ষণ নিজের ফুটানি বজায় রাখতে পারে না। সামান্য একটু খোঁচা খেলেই চুপসে যায়। বহু খোঁচা খেয়েও নীলমাধব কিন্তু সুডোল ছিল। সর্ব্বদাই অনিন্দনীয় চেহারা, অনিন্দনীয় কথাবার্ত্তা, অনিন্দনীয় পরিচ্ছদ, এবং সমস্ত ধারের ওপর। সুতরাং যা অনিবার্য্য, তাই একদিন ঘটল—প্রেম। নীলমাধব ও কিসমিসকুমারী। একটি রঙিন লেফাপা আর একটি রঙিন লেফাপাকে দেখে উ৺লা হয়ে উঠল। পিসেমশায়েব বাসায় যক্ষ্মাগ্রস্ত স্ত্রী কাঁদে আব কাসে। রোগা উলঙ্গ ছেলেমেয়ে দুটো রাস্তায় রাস্তায় ছোটলোকের ছেলেদের সঙ্গে ছুটোছুটি ক'রে বেড়ায়। ছেলেটা একদিন মোটর-চাপা প'ড়ে ম'রেই গেল। নীলমাধব তিন দিন পরে বাড়ি ফিরে পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ শুনলে। বিশেষ বিচলিত হ'ল না। পিসেমশায় অনুযোগ ও ভৎর্সনা করতে এসে স'রে পড়লেন। নির্ব্বাক নীলমাধবের নিষ্পলক দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকবার মত বীর্য্য তাঁর ছিল না। সবাই জানে, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ ক'রে নীলমাধব অহোরাত্রি চাকরি খুঁজছে। কখনও বাড়ি আসে—কখনও আসে না। যেদিন নীলমাধবেব স্ত্রী ম'ল, সেদিনও নীলমাধব বাড়ি নেই। উঠনে পিসেমশায় ও পাড়ার কয়েকজন দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঘরের ভেতরে বস্ত্রাচ্ছাদিত শব নীলমাধবের জন্যে অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ আলু-থালু বেশে উদ্‌ভ্রান্ত-দৃষ্টি নীলমাধব এসে হাজির। সকলে পথ ছেড়ে দিলেন। নীলমাধব সোজা গিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল। মৃতদেহের কাছে ক্রন্দনাকুল মেয়েটি এবং পিসীমা ব'সে ছিলেন। নীলমাধব তাদের ঘর থেকে বের ক'রে দিলে, ভাবটা—শেষবিদায় নেবার বেলায় সে একাই থাকতে চায়। মেয়ে এবং পিসী ত্রস্তভাবে বেরিয়ে গেল।

নীলমাধব ঘরের কপাট ভেজিয়ে দিলে। আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা কেটে গেল—নীলমাধব বেরোয় না। অনেকক্ষণ ইতস্তত ক'রে পিসেমশায় অবশেষে কপাটে ছোট্ট টোকা দিলেন। কপাট খুলে গেল—ঘরে নীলমাধব নেই, বস্ত্রাচ্ছাদিত শব বস্ত্রাচ্ছাদিতই রয়েছে। ঘরের অপর দরজাটি দিয়ে নীলমাধব নীরবে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেছে।

কিসমিসকুমারী বড় আর্টিস্ট ছিলেন না, তাঁর রঙিন লেফাপা ছিঁড়ে গণিকা বেরিয়ে পড়েছিল। নীলমাধবের লেফাপা কিন্তু অত অপলকা নয়—সে যে নিঃস্ব বেকার, এ কথা ঘুণাক্ষরে সে প্রকাশ করলে না। স্ত্রীটি ম'রে সুবিধেই হ'ল তার। সে নির্বিকার চিত্তে মৃতা স্ত্রীর গা থেকে গয়নাগুলি খুলে নিয়ে গেল। স্ত্রীর গায়ে তার বাপের দেওয়া যা দু চারখানা গয়না ছিল, তাই বিক্রি ক'রেই নগদ আটশো টাকা হ'ল। পাঁচশো টাকা দিয়ে একটা ভাল নেকলেস কিনে সে কিসমিসকে উপহার দিলে। এমন অভিজাতসুলভ ঔদাসীন্যভরে দিলে যে, কিসমিসকুমারী আত্মহারা হয়ে গেলেন। তার বুঝতে বাকি রইল না যে, নীলমাধব প্রকৃতই তার জীবনসর্বস্ব। অতিশয় দ্রুতবেগে অন্তরঙ্গতা বাড়তে লাগল। বেশি দিন নয়, মাস তিনেকের মধ্যেই কিসমিসকুমারীকে পুনরায় নতুন ধরনে আত্মহারা হতে হ'ল। ঘুম ভেঙে একদিন রাত্রে তিনি দেখলেন—শয্যা শূন্য, নীলমাধব নেই। খানিকক্ষণ পরে দেখলেন—দেরাজও শূন্য, গয়নার বাক্স নেই। জীবনসর্বস্ব তাঁর খোসসর্বস্ব নিয়ে সরেছে। গয়নার বাক্সে দশটি হাজার টাকার গয়না ছিল।

ভদ্রলোক চুপ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, তারপর?

তারপর বছর কয়েক পরে নিখুঁত স্যুট ও নিখুঁত ডিগ্রী ধারণ ক'রে নীলমাধব পুনরায় যখন কলকাতায় পদার্পণ করলে, তখন সে আয়ত্তাতীত। বিলেত থেকেই একটা বড় চাকরি নিয়ে সে এসেছে।

খোঁজ ক'রে জানলে যে, পিসেমশায় তার মেয়েটিকে পাত্রস্থ ক'রে নিজে স্বর্গারোহণ করেছেন। অরক্ষিত কিসমিসটিও সাধারণ নিয়ম অনুসারে পিপীলিকাভুক্ত হয়েছে।—ভদ্রলোক পুনরায় চুপ করিলেন।

তারপর?

এত কাণ্ড করলে তো, ভেতরের মানুষ কিন্তু চাপা পড়ল না। সমস্ত ভণ্ডামির আবরণ ভেদ ক'রে, সমস্ত ঐশ্বর্য্যের বন্ধনমুক্ত হয়ে, চাকরির সমস্ত মোহ ত্যাগ ক'রে তাকে বেরিয়ে আসতেই হ'ল দেশের ডাকে—

কি রকম? কি চাকরি করতেন তিনি?

ভদ্রলোক স্মিত মুখে চুপ করিয়া রহিলেন। আমি আর থাকিতে পারিলাম না, জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার নামটা কি?

একটু হাসিয়া বলিলেন, আপনি আমাকেই নীলমাধব ভেবেছেন নিশ্চয়। আমার নাম ননী দাস—খুব ডিস্অ্যাপয়েণ্টেড হলেন, নয়? আমি সামান্য ব্যক্তি—

ননীবাবুর ট্রেন আসিল, তিনি চলিয়া গেলেন। আমি আমার ট্রেনের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। হঠাৎ কানে আসিল, দূরে একটি বেঞ্চে বসিয়া একটি যুবক আর একজনকে বলিতেছে, নীলমাধববাবু ব'লে একটি অদ্ভুত লোক আজ এসেছিলেন, চ'লে গেলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কার—

আমি সবিস্ময়ে আগাইয়া গিয়া বলিলাম, উনি তো ননী দাস।

যুবকটি হাসিয়া বলিল, ও, আপনাকে উনি ননী দাসের গল্পটা বলেছেন বোধ হয়। আমরাও প্রথমে ওঁকে ভেবেছিলাম ননী দাস। কিন্তু ওঁকে জিজ্ঞেস করতে উনি বললেন যে, ওঁর নাম নীলমাধব।

আমি নির্ব্বাক হইয়া রহিলাম। পরে জানিয়াছি, উঁহার আসল নাম—থাক, নামটা আর করিব না, বিখ্যাত লোককে খেলো করিয়া গৌরব বাড়িবে না।

নাথুনির মা

Fixity of Purpose-এর বাংলা কি ?

উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা ?

যাহাই হোক, ইহার সুন্দর একটি উদাহরণ সেদিন দেখিয়াছিলাম। গল্পটি বলিবার পূর্ব্বে "লক জ" কাহাকে বলে, তাহাও বুঝানো দরকার। "লক জ" (Lock Jaw) তাহাকেই বলে, যাহা হইলে ব্যায়ত আনন আর বন্ধ হয় না, ব্যয়তই থাকে। হাই তুলিতে গিয়া অনেক সময় এক বিপদ ঘটে। মুখ কিছুতেই বোজে না, হাঁ করিয়াই থাকিতে হয়, যতক্ষণ না কোন ডাক্তার চোয়ালের হাড়টি যথাস্থানে বসাইয়া দেন। ইহার ঠিক ডাক্তারি নাম ডিস্‌লোকেশন অব ম্যাণ্ডিব্‌ল্ (dislocation of mandible),—একবার হইয়া পড়িলে সঙিন "পরিস্থিতি"।

একটি রোগীকে লইয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিতে হইয়াছিল। সকালে চোখ হইতে ঘুম ছাড়িতেছিল না। গৃহিণীর বারম্বার তাগাদা সত্ত্বেও তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া বিছানায় পড়িয়া ছিলাম।

'কড়কড়' শব্দে—বাজ পড়িল না, দুয়ারের কড়া নড়িল।

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, একটি আধ-ঘোমটা-দেওয়া কম-বয়সী মেয়ে একটি বুড়ীকে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। চিনিতে পারিলাম—নাথুনির স্ত্রী ও মা। ইহাদের বাড়িতে ইতিপূর্ব্বে চিকিৎসা করিয়াছি। নাথুনি স্থানীয় ময়দার কলে চাকরি করে।

কি হ'ল ?

বুড়ী নীরব।

নাথুনির বউ বলিল, মায়ের মুখ হাঁ হয়ে গেছে, বুজছে না।—বলিয়া সে মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল।

তাই নাকি? দেখি—

দেখিলাম, ঠিকই তাই—বুড়ির 'জ' স্থানচ্যুত হইয়াছে।

নাথুনি কোথায়?

নাইট-ডিউটি থেকে ফেরে নি এখনও।

এ রকম হ'ল কি ক'রে? হাই তুলতে গিয়ে?

বধূই উত্তর দিল (বুড়ীর পক্ষে কথা বলা অসম্ভব), না, হাই তুলতে গিয়ে নয়।

তবে?

এমনই।

এমনই কি ক'রে হবে, কিসের জন্যে হাঁ করেছিল?

বধূটি তখন ঈষৎ হাসিয়া অবনত মস্তকে পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ দিয়া মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে সসঙ্কোচে বলিল, মা আমাকে গাল দিচ্ছিলেন। অনেকক্ষণ গাল দেবার পর যেই 'পোড়ারমুখী' বলতে গেছেন, অমনই 'পোড়ার' পর্য্যন্ত ব'লেই —

মুখে আঁচল দিয়া ঘাড় ফিরাইয়া সে হাস্য গোপন করিল। বুড়ীর চোখের দৃষ্টি অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল।

কতক্ষণ হয়েছে?

আধ ঘণ্টা হবে।

আচ্ছা, ব'স তোমরা, এখুনি ঠিক ক'রে দিচ্ছি আমি।

ভাবিলাম, মুখরা বুড়ীটা আর একটু শাস্তি-ভোগ করুক, আমি ততক্ষণ প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া লই।

রোগী দেখিবার ঘরটায় তাহাদের বসাইয়া আমি ভিতরে চলিয়া গেলাম।

ফিরিলাম প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে।

আসিয়া বিধিমত দুই হাতের দুইটা বুড়া আঙুল বুড়ীর মুখগহ্বরে পুরিয়া নীচের চোয়ালের হাড়টায় বেশ জোরে চাপ দিয়া টান দিলাম। খুট করিয়া হাড় যথাস্থানে বসিয়া গেল।

মুখ হইতে বুড়া আঙুল দুইটি বাহির করিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ী বলিল, মুখী!

গন্ধ-কবিতা

প্রকাণ্ড বাড়ি রাস্তার ধারে। গিজগিজ করছে লোকজন। আলো, বাজনা, কলরব—বিয়েবাড়ি। রাস্তার ধারের ঘরটিতে ব'সে আছেন নিমন্ত্রিতেরা, নানা জাতের, নানা মাপের, নানা রঙের। ঘরের বাইরে তাদের জুতোর সারি, তাও নানা জাতের, নানা মাপের, নানা রঙের। শানাই বাজছে। "তপসে মাছ, চাই তপসে মাছ—" হেঁকে গেল ফেরিওয়ালা। কেষ্টবাবু মুখবিকৃতি-সহকারে দেশলাইয়ের কাঠি চালালেন কর্ণকুহরে।

পড় ময়না, পড়, রাধাকৃষ্ণ—

ফুটপাথের এক ধারে ব'সে পাখী পড়াচ্ছে কে একজন।

বিশাল খাঁচাটা তার বেশ পুরু কাপড় দিয়ে ঢাকা, বাইরের গোলমালে ময়নার তপোভঙ্গ হবার সুযোগ নেই কোনও। নিশ্ছিদ্র আবরণ।

উলুধ্বনি উঠল অন্তঃপুর থেকে। শাঁক বাজল।

ঘরের ভেতর মৈত্র মশায় বললেন, বেজায় গরম পড়েছে হে, উঃ!

মুখুজ্যে মশায় হাসলেন, কাসলেন বোস মশায়। শুরু থেকেই যেমন করছিল কোণের দিকের অল্পবয়স্ক ছোকরাগুলি, ফুসফুস গুজগুজ ক'রে হাসাহাসি করতে লাগল তেমনই ভাবেই।

ময়না, ময়না, পড় বাবা—

ঘোলের শরবত নিয়ে প্রবেশ করলেন একজন। টিনের ট্রের ওপর সারিবদ্ধ কাচের গ্লাসে গোলাপী রঙের পানীয়।

আমাকে এক টুকরো বরফ দিতে পারেন ?—অনুরোধ করলেন মৈত্র মশায়। বরফ দেওয়া হ'ল। তিনি হেঁট হয়ে সেটা ঘষতে লাগলেন ঘাড়ের ঘামাচিতে।

বেলফুল চাই, বেলফুল!—একটা কাঠিতে বেলফুলের মালা ঝুলিয়ে জানলার কাছে খানিকক্ষণ ঘোরা-ফেরা ক'রে চ'লে গেল একটা লোক। বেরিয়ে এলেন ক্রুদ্ধ কর্ত্তা একটা চাকরকে গাল দিতে দিতে। চটা মেজাজের লোক, গলা ভেঙেছে। এসেই আবার ঢুকে গেলেন।

পড় ময়না, রাধাকৃষ্ণ, রাধা-আ-কৃষণ—

অক্লান্তভাবে পড়িয়ে চলেছে লোকটি।

বৃষ্টির নাম নেই, ছি ছি!—মৈত্র মশায় বললেন।

আজকের দিনটা না হয় যেন, কাজকর্ম্মের বাড়ি।—টিপ্পনী কেটে হাসলেন মুখুজ্যে মশায়। মুখের সামনে হাতটা মুঠো ক'রে বোস মশায় আস্তে কাসলেন। দৃষ্টিপাত করলেন একবার সন্তর্পণে ঘুমন্ত নাতিটির প্রতি। ভারি বায়নাদার ছেলে, ঘুমিয়ে রেহাই দিয়েছে তাঁকে।

চোর, চোর, চোর—

সচকিত হয়ে উঠল সবাই। উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে গেল একটা লোক। পিছু পিছু ছুটল জনকয়েক। আশান্বিত হ'ল সবাই। ছোকরার দল বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে রইল সোৎসাহে। একটু পরেই কিন্তু তাদের ফিরতে হ'ল ঘরের ভেতর হতাশ্বাসে। চোর পালিয়েছে। অনুসরণ-কারীরা ফিরে এলেন হাঁপাতে হাঁপাতে।

ময়না, ময়না, পড় বেটা, রাধাকৃষ্ণ—

আবেগভরে পড়াচ্ছে লোকটি।

ভেতর থেকে খাবার ডাক এল। প্রায়-উন্মাদ কর্ত্তা বেরিয়ে এসে করজোড়ে ভগ্ন কণ্ঠে আহ্বান করলেন সকলকে। সদলবলে উঠলেন

সবাই, বায়নাদার নাতিটিও উঠল। তেতলার ছাতে জায়গা হয়েছে। শালপাতা, মাটির খুরি, মাটির গেলাস যদিও, আহার্য্য কিন্তু উঁচুদরের। চর্ব্ব, চুষ্য, লেহ্য, পেয়। ছ্যাচড়াটি তো নিখুঁত। ভোজনপটুতা দেখালেন অনেকেই। কোমরে-গামছা-বাঁধা ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর পরিবেশকের দল সুযোগ পেলেন নিজ নিজ মেরুদণ্ডের শক্তি পরীক্ষা করবার। বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটল। আরও কিছুক্ষণ কাটল মুখপ্রক্ষালনপর্ব্বে। অবশেষে বাঁ হাতে পান এবং ডান হাতে খড়কে নিয়ে বাইরে এলেন সবাই। এসেই একটা হর্ষ-বিষাদ। মুখুজ্যে, মৈত্র এবং বোস মশায়ের জুতো নেই।

রাধাকৃষ্ণ, পড় ময়না—

পক্ষী-শিক্ষক উঠতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে সবাই গিয়ে প্রশ্ন করলে তাকেই। ঘিরে দাঁড়াল।

ওহে, এঁদের জুতো কোথা গেল ?

জুতো! কার জুতো ?

বিস্মিত হ'ল সে।

এঁদের ?

সে আমি কি জানি মোসাই ?

এদিকে কাউকে আসতে দেখেছ ?

আমি কিছুই দেখি নি মোসাই, আমি এক মনে আমার পাখী পড়াচ্ছি।

নিরস্ত হলেন সবাই।

চুমকুড়ি দিয়ে সে আবার শুরু করলে, পড়, পড় বেটা, রাধাকৃষ্ণ, রাধা-আ-কৃষণ—

মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে সবাই ভাবলে, সেই পলাতক চোরটাই বুঝি

তা হ'লে আবার—। মুখুজ্যে রসিকতা করলেন, ব্যাটার রস-বোধ আছে হে, সেরা তিনটি জোড়া বেছে নিয়েছে! আশ্চর্য্য ব্যাপার, মৈত্র ঘাড় চুলকে স্থির করলেন, এই তুচ্ছ ব্যাপারটা বাড়ির কর্ত্তাকে না বলাটাই সমীচীন হবে বোধ হয়। বোস মশায় ভাবছিলেন, এত রাত্রে রিক্শা মিলবে কি না!

ময়না, ময়না, পড় বেটা—

দাদু, আমি ময়না দেখব।

নাকী স্বরে আবদার শুরু করলে নাতিটি। নাতির দিকে আড়-চোখে একবার চেয়ে মুখের সামনে হাত মুঠো ক'রে কাসলেন একটু বোস মশায়।

দাদু, আমি ময়না দেখব।

রাধাকৃষ্ণ, পড় বেটা, রাধাকৃষ্ণ—

ওর সম্বন্ধেও আলোচনা হ'ল একটু। কেষ্টবাবু বললেন, সেদিন গ্রে স্ট্রীটে একটা বাড়ির সামনে তিনি একেই দেখেছিলেন, ঠিক এমনই ভাবে ব'সে পাখী পড়াচ্ছিল।

যতীনবাবুও দেখেছিলেন বললেন সুকিয়া স্ট্রীটে।

দাদু, আমি ময়না দেখব।

নগ্ন-পদ বিপন্ন বোস মশায় কিংকর্ত্তব্য ভাবছিলেন।

ও দাদু, ময়না দেখব আমি।

এমন সময় রাগী কর্ত্তাটি বেরিয়ে এলেন।

ও দাদু, ময়না দেখব আমি।

কান্না শুরু করলে।

কি চাই খোকা তোমার?

ময়না দেখব।

কই ময়না ?

ওই যে।

এগিয়ে গেলেন কর্ত্তা খাঁচার কাছে।

এতে ময়না আছে ?

হাঁ, কর্ত্তা।—পাখী-ওলা বললে।

খোকাকে দেখাও একবার।

পাখী আমি কাউকে দেখাই না।

একবার দেখাতে ক্ষতি কি ?

না।

এর মানে কি ?

আমার খুশি।

খুশি! তার মানে ?—উদ্দীপ্ত হলেন কর্ত্তা।

আমি দেখাব না।

স'রে পড়বার উপক্রম করলে লোকটি। রোক চ'ড়ে উঠল কর্ত্তার।

দেখাতেই হবে তোমাকে।

জোর ক'রে খুলে ফেললেন খাঁচার আবরণ। দেখা গেল, শুধু মৈত্র, মুখুজ্যে এবং বোস মশায়েরই নয়, প্রকাণ্ড খাঁচাটি ভাল ভাল জুতোয় পরিপূর্ণ। ময়না নেই।

কাকের কাণ্ড

কা—কা—কা—কা—

জগত্তারিণী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ঘরের ভিতর হইতে অতি কষ্টে বাহির হইয়া বলিলেন, হু-স—

কাকটা উড়িয়া গিয়া রান্নাঘরের ছাতে বসিল। জগত্তারিণী খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পুনরায় ঘরের ভিতর ঢুকিলেন। কয়দিন হইতে কোমরে এমন একটা ব্যথা হইয়াছে! কোমরের অপরাধ নাই, বয়সও তো পঁয়ষট্টি পার হইতে চলিল। ঘরে ঢুকিয়া মুখবিকৃতিসহকারে তিনি উপবেশন করিলেন এবং কাঁথা সেলাইয়ে মন দিলেন। লতিকার ছেলে হইয়াছে, তাহাকে পাঠাইতে হইবে।

কা—কা—কা—কা—

অমঙ্গল-আশঙ্কায় জগত্তারিণীর অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। হাবু, গবু, দেবু, নিপু চার ছেলেই বিদেশে, কোলের ছেলে টিপু যদিও বাড়িতে আছে; কিন্তু তাহারও শরীরটা ভাল নাই, এম. এ. পরীক্ষার খাটুনিতে ছেলের শরীরটা রোগা হইয়া গিয়াছে। সে উপরে তেতলার ঘরে শুইয়া ঘুমাইতেছে। ছোট নাতিটুকু পাটনা গিয়াছে ফুটবল ম্যাচ খেলিতে—যা গোঁয়ার-গোবিন্দ ছেলে, কখন যে কি করিয়া বসে ঠিক নাই। ইভা, নিভা—মেয়ে দুইজন শ্বশুর-বাড়িতে। তাহাদেরও অনেকদিন চিঠিপত্র আসে নাই। ছোট বউ মুখুজ্যেদের বাড়ি নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছে। নীচে কেহ নাই। নির্জ্জন দ্বিপ্রহর।

কা—কা—কা—কা—

জগত্তারিণীর মনে পড়িল, কর্ত্তা যে অসুখে মারা যান, সেই অসুখটি হইবার পূর্ব্বে ঠিক এমনই ভাবে কাক ডাকিয়াছিল। কি অলুক্ষণে ডাক!

কা—কা—কা—কা—

জগত্তারিণী আবার কষ্ট করিয়া উঠিলেন।

হু-উ-স—

কাক উড়িয়া কদমগাছের ডালটায় বসিল।

কা—কা—কা—কা—

হুস—হুস—

কাক উড়িল না, কিন্তু নীরব হইল এবং ঘাড় বাঁকাইয়া জগত্তারিণীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

জগত্তারিণী স্বগতোক্তি করিলেন, নবান্নের দিন যখন পেসাদ খেতে দেওয়া হয়, সেদিন পাত্তা থাকে না কারও—এখন এসেছেন জ্বালাতে!

জগত্তারিণী ঘরের মধ্যে গেলেন, মুখবিকৃতিসহকারে পুনরায় বসিলেন এবং চশমাটি ঠিক করিয়া লইয়া সেলাইয়ে মন দিলেন।

কা—কা—কা—

জ্বালিয়ে খেলে তো মুখপোড়া!

কা—কা—কা—কা—

আবার উঠিতে হইল।

হুস—হুস—যা—যা—

কাক বলিতে লাগিল, কক্—কক্—কক্—

ভারি ত্যাঁদড় তো মুখপোড়া!

কক্—

দেখবি তবে?

হস্ত উত্তোলন করিয়া জগত্তারিণী একটা কিছু ছুঁড়িয়া মারিবার ভান

করিলেন। কাক ভান বোঝে। সে এক ডাল হইতে আর এক ডালে লাফাইয়া বসিল এবং জগত্তারিণীকে রাগাইয়া দিবার জন্যই যেন তাঁহার দিকে গলা বাড়াইয়া বাড়াইয়া র-ফলা যুক্ত করিয়া ডাকিল, ক্র—ক্র—ক্র—

হুস—

কাক চুপ করিল এবং মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া সামনের ডালটার উপর ঠোঁট শানাইতে লাগিল।

জগত্তারিণী অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন, পাজি কোথাকার। ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। পুনরায় অতি কষ্টে বসিয়া প্রসারিত কাঁথাটায় মনোনিবেশ করিলেন। মিনিট খানেক বেশ নিবিষ্ট মনেই সেলাই করিতে পারিলেন। কিন্তু আবার—

কাঙাক্—কাঙাক্—কাঙাক্—

অনুনাসিক কণ্ঠে ডাকিতেছে।

জগত্তারিণী ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, কিন্তু উঠিলেন না! ডাকুক। বার বার আর কোমরের ব্যথা লইয়া উঠিতে পারেন না তিনি। ছোট বউ সেই যে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছে, এখনও পর্য্যন্ত ফিরিবার নাম নাই। এমন আড্ডাবাজ হইয়াছে আজকালকার মেয়েরা!

কা—কা—কা—কা—

জগত্তারিণী আরও দুইটা ফোঁড় দিলেন।

কা—কা—কা—

আরও দুইটা ফোঁড় দিলেন।

কা—কা—কা—কা—

জগত্তারিণীর মনে হইল যেন বলিতেছে, খা—খা—খা—! অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল।

খাটের রেলিঙে ভর দিয়া আবার উঠিতে হইল তাঁহাকে।

জ্বালাতন!

কা—কা—কোয়্যাক্—

দূর হ—

কা—কা—কা—কা—

দূর দূর—দূর হ—

কা-আ—কা-আ—কা-আ-—

তবে রে মুখপোড়া—

জগত্তারিণী কষ্টে সিঁড়ি ভাঙিয়া উঠানে নামিলেন, আরও কষ্ট করিয়া একটি ছোট ঢিল কুড়াইয়া সক্রোধে সেটি কাকের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করিতে গিয়া নিজেই পড়িয়া গেলেন। সকালে এক পশলা বৃষ্টি হওয়াতে উঠানটা পিছল হইয়া ছিল।

একজন সাব্‌ডিভিশনাল অফিসারকে মহকুমার নানাবিধ জরুরি কাজ ফেলিয়া, একজন মুন্সেফকে অনেকগুলি দরকারী মকদ্দমার শুনানি মুলতুবি রাখিয়া, একজন হাই-স্কুলের হেডমাস্টারকে বহুবিধ কর্ত্তব্য স্থগিত করিয়া এবং একজন ডাক্তারকে অনেকগুলি শক্ত রোগী ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিতে হইল। সকলকেই সপরিবারে। নিভা দানাপুর হইতে এবং ইভা কলিকাতা হইতে সংসার ফেলিয়া সপুত্রকন্যা আসিয়া হাজির হইলেন। পৌত্রী লতিকাও তাহার কচি ছেলেটিকে লইয়া আসিয়া পড়িল। টুকুদের ফুটবল-ম্যাচে 'ড্র' হইয়াছিল, টুকুই দলের মেরুদণ্ডস্বরূপ, কিন্তু টেলিগ্রাম পাইয়া সমস্ত দলটিকে মেরুদণ্ডহীন করিয়া দিয়া সেও চলিয়া আসিল।

টিপু চতুর্দ্দিকে টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছিল—Mother seriously ill; come immediately.

এখন দেখা যাইতেছে, তত সিরিয়াস নয়, হাড়-টাড় ভাঙে নাই, কোমরে একটু চোট লাগিয়াছে মাত্র। পড়িয়াই অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ডাক্তাররা বলিতেছেন, তাহা দুর্ব্বলতার জন্য। ঠিক আগের দিনই নির্জ্জলা একাদশী ছিল। বহুকাল পরে পুত্র-কন্যা-পৌত্র-পৌত্রীদের একত্রিত দেখিয়া জগত্তারিণীর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তাঁহার কোমরের ব্যথা যেন অর্দ্ধেক সারিয়া গেল। তিনি বালিশে ভর দিয়া সকলের বারণ সত্ত্বেও ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন এবং স্নেহ-সজল কণ্ঠে বলিলেন, তোদের সবাইকে রেখে এখন ভালয় ভালয় যেতে পারলেই বাঁচি আমি।

টিপু বলিল, ভাগ্যে আমি ঠিক সেই সময়ে ওপর থেকে নেবে এসেছিলুম, তা না হ'লে কি কাণ্ডই যে হ'ত!

বড় ছেলে—যিনি এস. ডি. ও.—তিনি বলিলেন, তখনই আমি বলেছিলাম, উঠোনটাও পাকা হয়ে যাক, কিন্তু তোমরা সবাই আপত্তি করলে।

মেজ ছেলে গবু—যিনি মুন্সেফ—তিনি বলিলেন, আজই হরেন ওভারশিয়ারকে ডাকিয়ে উঠোনটা বাঁধাবার ব্যবস্থা কর, তবে খুব বেশি পালিশ যেন না করে।

সেজ ছেলে দেবু—হেডমাস্টার—বলিলেন, তা ঠিক।

ন ছেলে নিপু—ডাক্তার—তিনি ব্লাড-প্রেশার মাপিবার যন্ত্রটা লইয়া প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন, ব্লাড-প্রেশারটা আর একবার মাপা দরকার।

বাহিরের বারান্দায় ছেলেমেয়েরা কলরব করিতেছিল। সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল লতিকার ছেলের গলা।

জগত্তারিণী হাসিয়া বলিলেন, ওলো নতি, খুব উঁচুদরের গলা হয়েছে যে তোর ব্যাটার। নিয়ে আয় ওকে আমার কাছে।

সমস্ত ঘটনার মূল সেই কাকটা পাশের বাড়ির চিলে-কোঠার ছাতে বসিয়া নানা ভঙ্গীতে ডাকিতেছিল, ক—কক্—কর্র্; কিন্তু গোলমালে তাহা আর জগত্তারিণীর কানে গেল না।

খেলা

বিড়ালের নাম।

যখন সে খুব ছোট ছিল, তখন সে নিজের পুচ্ছটিতে থাবা মারিয়া মারিয়া খেলা করিত বলিয়া গৃহিণী তাহার নাম রাখিলেন—খেলা। এখন কিন্তু খেলা প্রবীণ। তাহার চপলতা যে কোন কালে ছিল, তাহা যাঁহারা তাহাকে শিশুকালে না দেখিয়াছেন, তাঁহারা কল্পনাই করিতে পারিবেন না। এখন খেলার ধ্যানগম্ভীর মূর্ত্তি। ঘাড়ে-গর্দ্দানে মোটা-সোটা চেহারা, কচিৎ চোখ খোলে। চোখ বুজিয়া থাবা গাড়িয়া বসিয়া আছে তো আছেই। বাহ্যজ্ঞানশূন্য তপস্বী যেন।

কিন্তু ভয়ানক চোর।

কে কোথায় কখন দুধের ঢাকাটা খুলিয়া রাখিতেছে, বাজার হইতে আনা মাছটা বারান্দা হইতে সঙ্গে সঙ্গে তোলা হইতেছে কি না, ছেলে-মানুষ বউটি কখন অন্যমনস্ক হইতেছে—সমস্ত তাহরে নখদর্পণে। অথচ কখন চুরি করে, ধরা যায় না। যখনই দেখ, হয় তুলসীতলার পাশে, না হয় গৃহিণীর পূজার ঘরের কোণে চোখ বুজিয়া ধ্যানগম্ভীর মূর্ত্তি বসিয়া আছে। যদি গালাগালি দাও, আস্তে আস্তে উঠিয়া নির্জ্জন স্থানে গিয়া বসিবে। বাড়ির কে কি চরিত্রের লোক, তাহা তাহার অবিদিত নাই।

ছোট ছেলেরা যখন খাইতে বসে, তখন খেলার আর এক মূর্ত্তি। তখন চোর নয়, ডাকাত। সোজা পাত হইতে মাছটি তুলিয়া লইয়া সামনেই বসিয়া খায়। মারিলেও নড়ে না। কেবল চোখ মুখ কুঁচকাইয়া ঘাড়টি পিছন দিকে ঈষৎ সরাইয়া চোখ বুজিয়া থাকে, দেহ সরায় না। মার বন্ধ হইলে পুনরায় খায়। ছোট ছেলেরা কত জোরেই বা মারিতে

পারে! চেঁচামেচি করিলে গৃহিণী আসিয়া পড়েন এবং খেলাকে ছোট্ট একটা চাপড় মারিয়া বলেন, পোড়ারমুখো মাছটা নিলে বুঝি পাত থেকে, কাঁদিস না, এনে দিচ্ছি আর একখানা। ক্ষতিগ্রস্ত বালকটিকে আর এক টুকরা মাছ আনিয়া শান্ত করেন এবং যতক্ষণ না তাহাদের খাওয়া শেষ হয়, সম্মুখে বসিয়া থাকেন। খেলা অপহৃত মৎস্যটি নীরবে ভক্ষণ করিয়া একটু দূরে গুটিসুটি হইয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকে। আহত আত্মসম্মানের মূর্ত্ত ছবিটি যেন। জানে, গৃহিণী থাকিলে সুবিধা হইবে না। উঁহাকে চটাইয়াও লাভ নাই, উঁহারই কৃপা আছে বলিয়া তাহার সাতখুন মাপ।

গৃহিণী তাহার দিকে সস্নেহে চাহিয়া বলেন, খেয়ে খেয়ে মুখপোড়ার গতর হয়েছে দেখ না! খেলার মুদিত চক্ষু মিটিমিটি করিতে থাকে।

ধুম্‌সো কোথাকার!

খেলা উত্তর দেয়, ম্যা-অ্যা-অ্যা-অ্যা-ও—

খুব আস্তে আস্তে; এত আস্তে যে, শোনা যায় না প্রায়। আন্দাজ করিয়া লইতে হয়।

বাড়িতে প্রচুর ইঁদুর। কিন্তু খেলার সেদিকে ঝোঁক নাই। থাকিবেই বা কেন! বাড়িতে অনায়াসলভ্য এত পুষ্টিকর খাদ্য থাকিতে সে আয়াস করিতে যাইবে কোন্ দুঃখে! মাঝে মাঝে তাহাকে অবশ্য গর্ত্তের কাছে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়, কিন্তু তাহা ঠিক একাগ্র উন্মুখ ওত পাতিয়া বসা নয়। তাহা অনেকটা যেন নধরকান্তি জমিদারবাবুর শখ করিয়া মাছ ধরিতে বসার মত। বাড়ির বড় ছেলে নৃপেন কিছুদিন হইল ডাক্তার হইয়াছে, তাহার ধারণা, পরীক্ষা করিলে খেলার ইউরিনে সুগার পাওয়া যাইবে।

খেলার অত্যাচারে সর্ব্বাপেক্ষা বিপন্ন হইয়াছে বাড়ির বধূটি—নৃপেনের বউ। অল্প বয়স, হুঁশ কম, সব সময়ে দুধে ঢাকা দিতে মনে থাকে না, রান্নাঘরে শিকল তুলিয়া দিতে ভুলিয়া যায়, মাছের অম্বলটা সময়মত শিকায় তুলিয়া রাখা হয় না। শ্বশুর-শাশুড়ীর বকুনি খাইতে খাইতে বেচারী হিমসিম খাইয়া যাইতেছে। অথচ খেলাকে কিছু বলিবার উপায় নাই, গৃহিণীর প্রিয় বিড়াল। তাঁহার ধারণা, গৃহস্থকে সাবধানতা শিক্ষা দিবার জন্যই ভগবান কাক বিড়াল সৃষ্টি করিয়াছেন। উহারা গৃহস্থের হিতৈষী। তবু একদিন বধূটি বিরক্ত হইয়া খেলাকে লক্ষ্য করিয়া একটা চেলাকাঠ ছুঁড়িয়াছিল। চেলাকাঠ খেলাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই, লাভের মধ্যে কুঁজাটা চুরমার হইয়া গেল।

সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মান্তিক হইল একাদশীর দিন। শ্বশুর সেদিন দিবসে লুচি এবং রাত্রে ফলাহার করেন। আম সাজাইয়া শাশুড়ী অপেক্ষা করিতেছেন।

বউমা, ক্ষীরটা দিয়ে যাও।

ক্ষীর আনিতে গিয়া বউমার চক্ষুস্থির হইয়া গেল। বাটিটি কেহ যেন ধুইয়া পুঁছিয়া রাখিয়াছে।

রাত্রে নৃপেনেরও চক্ষুস্থির হইবার উপক্রম হইল।

মীট্‌সেফ! মীট্‌সেফ কোথা পাব হঠাৎ?

কিনে আন একটা।

সে যে প্রায় দশ-বারো টাকার ধাক্কা, বেশিও হতে পারে। তা ছাড়া—

তা হোক, তবু কিনে আন তুমি, খেলা আমাকে পাগল করবার যোগাড় করেছে। সকলের বকুনি শুনতে শুনতে পাগল হয়ে গেলাম আমি।—বধূর আবদারমাখা কণ্ঠস্বর ও বিপন্ন মুখচ্ছবি নৃপেনকে বিব্রত

করিল। প্রথমত হাতে টাকা নাই, এই তো সবে প্র্যাক্‌টিস শুরু করিয়াছে, দ্বিতীয়ত ধারেও যদি সে মীট্‌সেফ কিনিয়া আনে, বাবা কি বলিবেন! অর্থাভাবে কত প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য অকৃত রহিয়াছে, হঠাৎ একটা মীট্‌সেফ— !

নৃপেন মাথা চুলকাইতে লাগিল।

পরদিন কিন্তু দুইটি কুলিবাহিত হইয়া একটা প্রকাণ্ড মীট্‌সেফ আসিয়া পড়িল। কুলির হাতে পিতার নামে নৃপেনের একটি চিঠিও। নৃপেন ডিস্‌পেন্সারি হইতে লিখিতেছে—

একটি মীট্‌সেফ পাঠাইতেছি। ইহা একজন রোগী আমাকে উপহার দিয়াছে।

খেলা মীট্‌সেফটির দিকে একবার চাহিল, বধূটির দিকে একবার চাহিল, তাহার পর সম্মুখের পা দুইটি বিস্তার করিয়া পিঠ বাঁকাইয়া হাই তুলিল এবং ধীরে ধীরে অন্যত্র চলিয়া গেল।

কয়েকদিন কাটিয়াছে।

পুনরায় একাদশী রজনী সমুপস্থিত। কর্ত্তা ফলাহার করিতে বসিয়াছেন। গৃহিণী আমের থালা লইয়া উপস্থিত হইলেন।

বউমা, ক্ষীরটা দিয়ে যাও।

বউমা মীট্‌সেফ খুলিয়া অবাক। মীট্‌সেফের কপাটটা ভাল করিয়া খুলিতেই খেলা গম্ভীর মুখে বাহির হইয়া গেল, ক্ষীরের বাটি খালি।

মীট্‌সেফের ছিটকিনিটা লাগাইতে ভুল হইয়া গিয়াছিল।

কোন্‌টা গল্প

এক

শুনিয়া রামলোচন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

ইহাই এই আখ্যানটির শেষ ঘটনা। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী যে সকল ঘটনাপরম্পরা এই শেষ ঘটনাটিকে সম্ভবপর করিয়াছে, তাহার ইতিহাস রামলোচনের জীবনব্যাপী ইতিহাস। তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ক্লান্তিজনক তো বটেই, বর্ত্তমান আখ্যায়িকার পক্ষে অবান্তরও। সুতরাং যথাসম্ভব সংক্ষেপেই বলিব।

রামলোচন মিত্র আজ যদিও বৃদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু এ কথা বিশ্বাসযোগ্য যে, এককালে তাঁহার যৌবন ছিল। শুধু ছিল নয়, বেশ প্রবলভাবেই ছিল। যৌবনকালে নানাবিধ শৌখিন কল্পনা তাঁহার মস্তকে পুষ্পিত হইয়া তাঁহার হৃদয়কে আলোড়িত করিত। সঙ্গীত, চিত্রকলা, কবিতা, ভোজনবিলাস, পরিচ্ছদ, প্রভৃতি প্রত্যেক জিনিসটিকেই তিনি শিল্পীর দৃষ্টিতে দেখিতেন এবং তদনুযায়ী চলিতেন। যাঁহারা রামলোচনবাবুকে চেনেন, তাঁহারা হয়তো আমার কথা শুনিয়া অবিশ্বাসের হাসি হাসিতেছেন। মাথায় কোঁকড়ানো বাবরি-চুলসমন্বিত ছিমছাম যে যুবকটি ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা শহরে বন্ধুগণের সহিত ঠুংরি গান, র‍্যাফেলের চিত্র, কাশ্মীরী পোলাও অথবা মস্‌লিনের সূক্ষ্মতার আলোচনায় মশগুল থাকিতেন, সেই যুবকটিই যে বর্ত্তমানের টাক-মাথা, ন-হাতি-কাপড়-পরা, শীর্ণকান্তি, জরাজীর্ণ রামলোচনবাবুতে পরিণতি লাভ করিয়াছেন, তাহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা সত্যই শক্ত। যাঁহারা হাসিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমি দোষ দিব না। আমি শুধু তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিতে অনুরোধ

করিব যে, বর্ত্তমানের কুদর্শন কটুভাষী রামলোচন সত্যই একদা সুদর্শন ও প্রিয়ভাষী ছিলেন। বর্ত্তমানের পেচকপ্রকৃতির ব্যক্তিটি সত্যই এককালে বসন্তকালের কোকিলের সঙ্গে উপমিত হইতে পারিতেন।

দুই

সেকালের যুবক রামলোচন মিত্র প্রতিজ্ঞাও করিয়াছিলেন যে, তিনি এমন একটি বালিকাকে বিবাহ করিবেন, যে বালিকা তাঁহার শিল্পীমনকে তৃপ্ত করিতে পারে। সংক্ষেপে, মেয়েটি রাঁধিতে পারিবে, ছবি আঁকিতে পারিবে এবং সুন্দরী হইবে। নাচটা সেকালে প্রচলিত ছিল না। থাকিলে রামলোচন পত্নীর গুণাবলীর মধ্যে নৃত্যকুশলতাও নিঃসন্দেহে কামনা করিতেন। এ কথাও অবশ্য নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, করিলে তাঁহার কামনা নিষ্ফল হইত। কারণ ভাবী পত্নীর মধ্যে তিনি যাহা যাহা কামনা করিতেছিলেন, তাহাই জোটানো দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। একাধারে সঙ্গীতজ্ঞা, চিত্রবিদ্যাপারদর্শিনী, রন্ধননিপুণা, রূপবতী কিশোরী সেকালে বেশি ছিল না। থাকিলেও হয়তো রামলোচন তাঁহাদের নাগাল পাইতেছিলেন না, কিংবা তাঁহারা রামলোচনকে ধরিতে পারিতেছিলেন না। মোট কথা, আকাঙ্ক্ষিত যোগাযোগ ঘটিয়া উঠিতেছিল না। কিছুদিন কাটিবার পর নিরুপায় রামলোচন বাধ্য হইয়া আদর্শ খর্ব্ব করিলেন। তিনি ইহাই স্থির করিলেন যে, ভাল রান্না করিতে পারে এরূপ একটি সুশ্রী মেয়ে মিলিলেই তিনি তাহাকে বিবাহ করিবেন। ছবি আঁকিতে না হয় না-ই জানিল; পরে শিখাইয়া লইলেই চলিবে। কিন্তু হায়, দুঃখের বিষয় হইলেও সত্যের খাতিরে ইহা ব্যক্ত করিতেই হইবে যে, এরূপ কন্যাও সুলভ হইল না। অনেক অনুসন্ধানের পর অবশেষে ক্ষেমঙ্করীর সন্ধান পাওয়া গেল। শোনা গেল, বালিকাটি

হারমোনিয়াম-সহযোগে থিয়েটার-সঙ্গীত গাহিতে পারে এবং রন্ধন-ব্যাপারেও নাকি সুনিপুণা। ক্ষেমঙ্করীর আত্মীয়স্বজন, চেনাশুনা সকলেই সমস্বরে ইহা বলিতে লাগিলেন। রামলোচনও একদিন গিয়া বালিকাটির গান শুনিয়া এবং রান্না খাইয়া আসিয়া তাহা সমর্থন করিলেন। মেয়েটি কিন্তু সুশ্রী নহে। রামলোচন পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে গেলে বিবাহ করা চলে না। কিন্তু তাহা যখন একেবারেই অসম্ভব, তখন ইহাকেই কণ্ঠলগ্ন করত ঝুলিয়া পড়া উচিত। পড়িলেনও।

তিন

বিবাহের পরেই ঠিক কয়েক বৎসর রামলোচন ও তৎপত্নী ক্ষেমঙ্করী কি ভাবে জীবনযাপন করিয়াছিলেন, তাহা আমার সঠিক জানা নাই। অনেকদিন পরে যখন রামলোচনের খবর লইবার সুযোগ পাইলাম, তখন দেখিলাম, তাঁহাদের জীবন নিষ্ফল হয় নাই। ছয়টি পুত্র এবং পাঁচটি কন্যা রামলোচনের গৃহ অলঙ্কৃত এবং ক্ষেমঙ্করীর কোমর বাতগ্রস্ত করিয়াছে। রামলোচন একদিন সক্ষোভে বলিলেন যে, তাঁহার যৌবনের বাতিকগুলি বাতাহত। বিবাহের পরই রামলোচন লক্ষ্য করিলেন যে, ক্ষেমঙ্করীর দেহ-গ্রন্থিগুলি কেমন যেন অমজবুত ধরনের। একটু ঠাণ্ডা লাগিলে অথবা পরিশ্রম করিলে গাঁটে গাঁটে ব্যথা হয়—শয্যাগত হইয়া পড়েন। ইহার জন্য প্রথম প্রথম তিনি অদৃষ্টকেই দায়ী করিতেন। কিন্তু ক্রমাগত সন্তান প্রসব করিয়া ক্ষেমঙ্করী যখন জখম হইয়া পড়িলেন, তখন কারণ আর অদৃষ্ট রহিল না—দৃষ্ট হইয়া পড়িল। ডাক্তারদের নির্দ্দেশ অনুযায়ী তিনি নিজেকেই ইহার জন্য দোষী সাব্যস্ত করিলেন এবং ক্ষেমঙ্করীর সহিত অনুরূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ক্ষেমঙ্করী-সন্নিধানে যতক্ষণ তিনি থাকিতেন, চলিত বাংলায় বলিতে গেলে,

গরু-চোরের ন্যায় সশঙ্কিত হইয়া থাকিতেন। এতাদৃশ বিপর্য্যয়ের মধ্যে ক্ষেমঙ্করীর সঙ্গীতকলার সম্যক পরিচয় পাইবার সুযোগ তো রামলোচনের ঘটিলই না, উপরন্তু রামলোচন পাচক-সমস্যায় দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। বস্তুত ইহাই এখন তাঁহার জীবনের প্রধানতম সমস্যা। ক্ষেমঙ্করী পঙ্গু হইলেও রন্ধন-শিল্পী। সুতরাং যা-তা ঠাকুর তাঁহার পছন্দ হয় না। রামলোচন অনেক কষ্টে একটি ঠাকুর যোগাড় করিয়া আনেন; দুই-চারি দিনেই তাহার নানা দোষ ক্ষেমঙ্করীর নিকট প্রকট হইয়া পড়ে। রামলোচনকেও সে সকল দোষের অমার্জ্জনীয়তা স্বীকার করিয়া অবিলম্বে তাহাকে ছাড়াইয়া দিতে হয় এবং নূতন পাচকের সন্ধানে বাহির হইতে হয়। যৌবনকালে পত্নী-অনুসন্ধানকালে যে সত্য তিনি আভাসে অনুভব করিয়াছিলেন, সারা জীবন ধরিয়া পাচক-অনুসন্ধান করিতে করিতে তাহা সম্পূর্ণভাবেই হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন—এ দেশে নিখুঁত কিছু পাওয়া অসম্ভব।

চার

নূতনতম যে পাচকটি সেদিন আসিয়াছিল, সেটি মিথিলার অধিবাসী। পরিধানে পীতাম্বর, ললাটে সচন্দন সিন্দূর, ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম, গৌর বর্ণ, আকর্ণবিশ্রান্ত পদ্মপলাশ নয়ন। রূপ দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। কিন্তু চক্ষু জুড়াইবার জন্য কেহ পাচক নিযুক্ত করে না। যে জন্য করে, সে বিষয়ে এই কমনীয়-কান্তি মৈথিলটির তুলনা মেলা ভার। সেদিন ক্ষুধার্ত্ত রামলোচন খাইতে বসিয়া দেখিলেন, ভাতগুলি পিণ্ডের মত, তরকারিগুলি অখাদ্য—একটি আগুনে পুড়িয়াছে, আর একটি নুনে পুড়িয়াছে এবং তৃতীয়টি কাঁচা আছে। অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় রামলোচন দুই-চারি গ্রাস আহার করিয়া

ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন। মৈথিলকে কিছু বলিলেন না। নানারূপ ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিয়া রামলোচন ইহাই সার বুঝিয়াছিলেন যে, আত্মসংযম হারাইলে তিনি অকূল পাথারে পড়িবেন। খুব সংযতভাবেই তিনি উঠিয়া গেলেন এবং ক্ষেমঙ্করীর নিকট গিয়া খুব সংযত কণ্ঠেই বলিলেন, এ বামুনটা তেমন সুবিধার নয়, বুঝলে? কিছুই জানে না রাঁধতে। সঙ্গীতচর্চ্চা করিয়াছিলেন বলিয়াই সম্ভবত ক্ষেমঙ্করী বিনা ঝঙ্কারে কিছু বলিতেন না। তিনি ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, রোজ রোজ বামুন পাবেই বা কোথা? ওকেই কোন রকমে চালিয়ে নাও। আর যাই হোক, নোংরা নয়। এর আগে যেটা এসেছিল, সেটা ইল্লতের ধাড়ি! এটা তবু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আছে।

ও, তাই নাকি? তবে থাক্।—ত্রস্ত রামলোচন বাহিরে চলিয়া গেলেন। বাহিরে গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ঘোর দুশ্চিন্তা হইল। এই মৈথিল পাচকের হাত হইতে কি করিয়া উদ্ধার পাইবেন, তাহাই চিন্তা করিতে করিতে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন।

পাঁচ

নিদ্রাভঙ্গ হইতেই রামলোচন পুলকিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কর্ণে অতি মধুর একটি সুর ভাসিয়া আসিল। অতি সুমিষ্ট কণ্ঠে গুনগুন করিয়া কে যেন ভৈরবী আলাপ করিতেছে! সুন্দর তো! রামলোচন-বাবুর জরাজীর্ণ বক্ষের মধ্যে যৌবনের সঙ্গীতপিপাসু মনেরও নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়া বসিল এবং রামলোচনকে শয্যাত্যাগ করিতে বাধ্য করিল। রামলোচন উঠিয়া আসিয়া দেখিলেন, নব-নিযুক্ত মৈথিল ঠাকুরটিই ওদিকের দাওয়ায় বসিয়া তন্ময় চিত্তে ভৈরবী আলাপ করিতেছে। রামলোচনবাবু হর্ষে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিলেন ও অবিলম্বে তাহাকে ডাকিয়া অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে

লাগিলেন। দেখিলেন, পাচক সঙ্গীতানুরাগী তো বটেই, যত্ন করিয়া শিক্ষাও করিয়াছে। রামলোচন বলিলেন, বেশ বেশ। তুমি থাক আমার কাছে। ভাবিলেন, রান্না যতই খারাপ করুক, গান শুনিয়া তৃপ্তি হইবে। তিনি ব্রাহ্মণকে উৎসাহিত করিলেন।

ছয়

পরদিন ক্ষেমঙ্করী স-ঝঙ্কারে বলিলেন, ও ঠাকুরকে আজই বিদেয় কর। ওর দ্বারা চলবে না।

থতমত খাইয়া রামলোচন বলিলেন, কেন?

রাঁধতে তো জানেই না—রান্নাঘরে ব'সে ব'সে পোড়ারমুখো রাগিণী ভাঁজছে। দূর কর ওকে—আজই তাড়াও।

রামলোচন কোন দিনই ক্ষেমঙ্করীর বিরুদ্ধাচরণ করেন না। আজও করিলেন না।

কেবল তাঁহার একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

সাত

গল্প পাঠ শেষ করিয়া গল্পলেখক সস্মিত মুখে স্ত্রীর পানে চাহিলেন। স্ত্রীর চক্ষু দুইটি কৌতুকে নৃত্য করিয়া উঠিল। বলিল, বাবা বাবা! তবু যদি তোমাকে একটি দিনের জন্যেও ঠাকুরের রান্না খেতে হ'ত। মাংসের কোর্মাটা ভাল হয় নি বুঝি আজ?

স্বামী হাসিয়া বলিলেন, মানুষ তা-ই কল্পনা করে, যা তার নেই। উল্টো অবস্থাটা ভেবে দেখতে বেশ লাগে। তুমি বেহাগের নতুন যে গতটা শিখেছ, বাজাও না—শুনি।

আজ থাক্, রাত হয়ে গেছে।—এই বলিয়া হঠাৎ সে বাতিটা নিবাইয়া দিল।

সংক্ষেপে উপন্যাস

এক

সেদিন মাঘের রাত্রি ছিল। টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে—অসম্ভব শীত। সঞ্জয় অন্যমনস্ক হইয়াই গলিটাতে ঢুকিয়াছিল। প্রায় জনশূন্য গলি—রাত্রি অনেক হইয়াছে। হনহন করিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে সঞ্জয়ের সহসা চোখে পড়িল, একটা খোলার ঘরের সম্মুখে রঙিন-কাপড়-পরা একটা মেয়ে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। ভীরু উৎসুক দৃষ্টি। সঞ্জয় দাঁড়াইয়া পড়িল।

দুই

এক বৎসর পরে।

সঞ্জয়ের অন্তর অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছিল। ছি—ছি—ছি—নিজেকে সে কোথায় নামাইয়াছে! তাহাকে ঘর হইতে দূর করিয়া দিল! না হয় সে মদ খাইয়া গিয়াছিল! তাহাতে হইয়াছে কি? মদ খাইয়া হল্লা করিবার জন্যই তো ওখানে যাওয়া। মানস-নেত্রে ছবিটা ফুটিয়া উঠিল। শ্যামকান্তি তন্বী যুবতী—নূপুরে দুলে ওড়নায়, পেশোয়াজে চুমকিতে জরিতে আলোক ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। সম্রাজ্ঞীর মত লীলায়িত ভঙ্গীতে কমনীয় বাহুটি তুলিয়া দ্বারদেশ দেখাইয়া আদেশ করিতেছে, অমন মাতলামি করেন তো বেরিয়ে যান এখান থেকে। স্বর্ণকঙ্কণের ঝনৎকার আবার যেন সে শুনিতে পাইল, লোহিত রেশম-গুচ্ছ-বিলম্বিত বাজুবন্ধের দোলকটি আবার যেন চোখের সম্মুখে দুলিয়া উঠিল।

পরদিন অতিশয় সংযত কঠিন মূর্ত্তি লইয়া সঞ্জয় গেল। নির্জ্জন

দ্বিপ্রহর। ঘরে আর কেহ ছিল না। সঞ্জয় দেখিল, সম্রাজ্ঞীরও রূপ বদলাইয়াছে। তবু কিন্তু অপরূপ। অতি সাধারণ একখানি নীলাম্বরী, ছোট একটি কাঁচপোকার টিপ, তাম্বূলরঞ্জিত পাতলা ঠোঁট দুইটিতে স্নিগ্ধ মৃদু হাসি. দীর্ঘ আঁখিপল্লবে সহৃদয় স্নেহচ্ছায়া। সঞ্জয়কে দেখিয়া তাহার সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

আসুন, আসুন। ভাবলাম, বুঝি রাগ ক'রে আসবেনই না। বসুন।

সঞ্জয় নীরবে আসন পরিগ্রহ করিল। কথা বলিবার অবকাশ পাইল না। সঞ্জয় বসিতেই সে হাসিমুখে উঠিয়া গিয়া দেওয়াল-আলমারি হইতে মদের বোতল ও গেলাস বাহির করিয়া সম্মুখের তেপায়ার উপব রাখিল এবং বলিল, নিন, খান।

সঞ্জয়ের অধর দুইটি নড়িয়া উঠিল, কিন্তু বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সে হাসিয়া অনুযোগভরে বলিল, ছি, ও-রকম মাতলামি করতে আছে? মদ খেলে ভদ্দরলোকের মত খেতে হয়।

মুখ টিপিয়া হাসিয়া নিজেই সে মদ ঢালিতে লাগিল।

বাসন্তী রঙের স্বচ্ছ সফেন সুরা।

নিন।

সঞ্জয়ের রগের শিরাগুলা দপদপ করিতেছিল।

সে হাত বাড়াইয়া গ্লাসটা লইল এবং পিকদানিতে সেটা উপুড় করিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

পিছন ফিরিয়া চাহিল না।

তিন

কয়েকদিন পরে একখানি পত্র।

তাহারই পত্র।

রাগ ক'রো না, ফিরে এস।

সঞ্জয় মুখ টিপিয়া একটা তিক্ত হাসি হাসিল। ঠিক করিল, যাইবে না। ও পাপকুণ্ড হইতে সরিয়া থাকাই ভাল।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারিল না। গেল।

গিয়া শুনিল, এইমাত্র সে বাহির হইয়া গিয়াছে। জনৈক বড়লোকের বাগান-বাড়িতে জলসা আছে।

চার

পরদিন গেল।

সেদিনও দেখা পাইল না।

তাহার পরদিনও সে যাইত, কিন্তু একটা টেলিগ্রাম পাইয়া বাড়ি চলিয়া যাইতে হইল। বাবা মারা গিয়াছেন।

দুই মাসের পূর্ব্বে ফিরিতে পারিল না। ফিরিয়া আসিয়াই কিন্তু আবার গেল। গিয়া শুনিল, সে অন্য ঠিকানায় উঠিয়া গিয়াছে।

ঠিকানা কেহ বলিতে পারিল না।

পাঁচ

সহসা একদিন ঠিকানা মিলিল।

প্রকাণ্ড বাড়ি।

প্রকাণ্ড গেট।

সঞ্জয় ঢুকিতে গেল, পারিল না।

দারোয়ান বলিল, হুকুম নেহি হ্যায়।

ছয়

দুই বৎসর পরে।

ত্রিশ টাকা বেতনের দীন কেরানী সঞ্জয় আপিস হইতে বাহির হইয়া সহসা একদিন দেখিল—দেওয়ালে দেওয়ালে, কাগজে তাহার ছবি।

সিনেমা-হাউসের সম্মুখে অসম্ভব ভিড়।

লোকে লোকারণ্য।

সঞ্জয় অতি কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল, কিন্তু টিকিট পাইল না। তৃতীয় শ্রেণীর সমস্ত টিকিট বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল।

অতি-আধুনিক

বিসর্পিত রেখায় নদী বহিয়া চলিয়াছে।

নদীর পরপার ঘনবন-সমাচ্ছন্ন, এপারে রুক্ষ পর্ব্বতমালা। একটি গুহামুখ দেখা যাইতেছে। পরপারবর্ত্তী ঘন অরণ্যের শাখা-পত্র-জটিল নিবিড়তা দৃষ্টি-দুর্ভেদ্য। অনেকক্ষণ লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, একটি বিরাট পাইথন একটি বিরাট বৃক্ষশাখা হইতে স্থিরভাবে ঝুলিয়া রহিয়াছে শিকারের প্রত্যাশায়। অরণ্যের ওপার হইতে একটা কোলাহল ভাসিয়া আসিতেছে। তীক্ষ্ণনখচঞ্চু মাছরাঙা একটা জলের উপর ছোঁ মারিয়া মারিয়া উড়িতেছে।

নদীতীরবর্ত্তী প্রান্তরে অরুণ, অশোক, বীরেন, চঞ্চল, নিমাই, নগেন, নটবর, কার্ত্তিক একটি অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে উবু হইয়া বসিয়া আছে। সকলেই উলঙ্গ, সকলেই কর্কশ-রোম, সকলেই শ্মশ্রু-গুম্ফ-সমন্বিত, সকলেরই শিরে অযত্নবিন্যস্ত কেশভার—কাহারও কপিশ, কাহারও পিঙ্গল, কাহারও কৃষ্ণবর্ণ। অদূরে ভূপাল বালুকা খনন করিয়া কি যেন অনুসন্ধান করিতেছে। নরেশও অগ্নিকুণ্ডের নিকট নাই, সেও নদীর ধারে ধারে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে।

নিপু, কানু, চম্পা, টুকু, বুদি প্রভৃতি অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারা ইতস্তত খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। কানুর হস্তে একখণ্ড ভাঙা মৌচাক, তাহা হইতে মধু ক্ষরিয়া পড়িতেছে, তাহার ভিতরে কীটাকৃতি মৌমাছি-শাবকেরা কিলবিল করিতেছে। কানু নির্ব্বিকার চিত্তে সবসুদ্ধ কামড়াইয়া কামড়াইয়া খাইতেছে, চম্পা লুব্ধ নয়নে চাহিয়া আছে। বুদির হাতে একটা জীবন্ত শামুক, সে সেটাকে একটা পাথরে ঠুকিয়া ঠুকিয়া ভাঙিতেছে, আহত শামুকটার লালা-পিচ্ছিল সর্ব্বাঙ্গ আঁকিয়া-বাঁকিয়া প্রতিবাদ করিতেছে। তাহার কিন্তু নিস্তার নাই। বুদির মুষ্টি কঠোর,

দন্ত তীক্ষ্ণ। নিপু একটা পলাতক কীটের গর্ত্ত-সমীপে ওত পাতিয়া বসিয়া আছে। রুগ্ন টুকু নাকী সুরে কাঁদিতেছে।

আরও কিছু দূরে রেবা, নিভা, মায়া, বেলা, শেফালি, মালবিকা, ক্ষমা, স্নেহলতা, মাধবী প্রভৃতি নানা বয়সের নারীগণ নানা কার্য্যে ব্যাপৃত। মালবিকা রেবার নিকট মাথা পাতিয়া বসিয়া আছে, রেবা উকুন বাছিতেছে। ক্ষমা কণ্ঠলগ্ন শাবকটিকে স্তন্যপান করাইতেছে। মায়া আহারে ব্যস্ত, তাহার হাতে কন্দ-জাতীয় কি যেন একটা আহার্য্য। নিভা কিছু করিতেছে না, সে অদূরে অবস্থিত পুরুষ-মণ্ডলীর দিকে মাঝে মাঝে চাহিয়া দেখিতেছে। তাহার ভ্রূ, অধরোষ্ঠ, স্তনযুগল মাঝে মাঝে কম্পিত হইয়া উঠিতেছে। বেলা, শেফালি, স্নেহলতা, মাধবী কতকগুলি কাঁচা চামড়া হইতে প্রস্তরখণ্ড দ্বারা মাংস কুরিয়া কুরিয়া পরিষ্কার করিতেছে। ইহারাও সকলেই উলঙ্গ। ইহাদের নিকটও একটি অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে।

আর একটু দূরে বৃদ্ধ দলপতি বৈদ্যনাথ একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া আর একটি ক্ষুদ্রতর প্রস্তরখণ্ডকে ঘষিয়া ঘষিয়া তীক্ষ্ণতর করিবার প্রয়াস পাইতেছে। বৈদ্যনাথও উলঙ্গ।

নিকটে কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে দুর্গন্ধ।

চারিদিকে চামড়া।

অনতিদূরে একটা মৃত ভল্লুক পচিতেছে।

একটি অগ্নিকুণ্ডে কতকগুলি ইন্দুরও পুড়িতেছে।

দুই

বৃদ্ধ দলপতি বৈদ্যনাথ প্রস্তর ঘষিতেছে এবং মাঝে মাঝে মায়ার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। চাহনি লালসাময়। মায়া বৈদ্যনাথেরই

কন্যা বটে, কিন্তু নবোদ্ভিন্নযৌবনা। তাহার অনাবৃত শরীরে যৌবন যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। ভ্রাতা নটবরও মাঝে মাঝে ভগ্নী মায়াকে দেখিতেছে। তাহারও দৃষ্টিতে ক্ষুধা।

রুগ্ন টুকু একটানা কাঁদিয়া চলিয়াছে।

বৈদ্যনাথের মুখমণ্ডল সহসা কঠিন হইয়া উঠিল, দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া সে আবার পাথর ঘষিতে লাগিল।

অরুণ সহসা মুখ তুলিয়া নিভার দিকে চাহিল।

নিভা হাসিল। শ্বা-দন্তগুলি চকমক করিয়া উঠিল।

নটবরের চোখে নিষ্করুণ দৃষ্টি।

নদীতীরে সঞ্চরমান অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক পুত্র নরেশ চর্ম্মোপরি অবনমিতা জননী শেফালির নগ্ন দেহটার পানে চাহিয়া ঈষৎ বিচলিত হইল। শেফালি প্রৌঢ়া। বৃদ্ধা স্নেহলতার অন্য কোন দিকে দৃষ্টি নাই, সে আপন মনে কাজ করিয়া চলিয়াছে, তাহার চামড়াটা প্রায় পরিষ্কার হইয়া আসিল। পলিতকেশিনী স্নেহলতা।

চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে একটা বৃহৎ শকুনি মৃত ভল্লুকটার নিকটে উপবেশন করিয়াই উড়িয়া গেল। নগেন তাহাকে তাড়াইয়া ভালুকটাকে টানিয়া নিকটে আনিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অরুণ, অশোক, কার্ত্তিক চীৎকার করিয়া উঠিল। ওপারে ঘন বনান্তরাল হইতে দ্বি-খড়্গ-সমন্বিত রোমশ একটা গণ্ডার ভীষণদর্শন মুণ্ডটা বাহির করিয়া ইতস্তত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে।

সকলেই চীৎকার করিতে করিতে এক এক খণ্ড প্রস্তর তুলিয়া তদভিমুখে ধাবমান হইল।

তিন

খানিকক্ষণ পরে।

গণ্ডার অন্তর্হিত হইয়াছে। উত্তেজনা-অবসানে সকলেই পুনরায় স্ব স্ব স্থানে বসিয়াছে। বৈদ্যনাথ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ঘষিত প্রস্তরের তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিতেছে। না, এখনও ঠিক মনোমত হয় নাই। আবার সে ঘষিতে শুরু করিল। একটা ভোঁতা স্থান কিছুতেই তীক্ষ্ণ হইতেছে না। ঘষিতে ঘষিতে সে মুখ তুলিয়া আর একবার মায়ার দিকে চাহিল। কন্দচর্ব্বণনিরতা মায়াও চাহিল। নবোদ্ভিন্ন-যৌবনা মায়া, মুখে মৃদু হাসি।

নটবর উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার দেহের সমস্ত পেশী শক্ত হইয়া উঠিয়াছে, নিশ্বাসের গতি-বেগ বাড়িয়া গিয়াছে। না, আর নয়। অনেকদিন সহ্য করিয়াছে সে। ওই বৃদ্ধটার আধিপত্য আর সহ্য করা যায় না। তাহার অন্তর মথিত করিয়া একটা কষ্ট ক্ষোভ তর্জ্জন করিয়া উঠিল। তর্জ্জন-শব্দে মায়া ফিরিয়া চাহিল, দন্তবিকাশ করিয়া অদ্ভুত একটা মুখভঙ্গী করিল। তীরবেগে ছুটিয়া গিয়া নটবর তাহাকে ধরিল। দুই হস্ত বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া সবলে তাহাকে আকর্ষণ করিল। মায়া ফোঁস করিয়া উঠিল—ছদ্ম কোপে। অর্দ্ধভুক্ত কন্দটা মাটিতে পড়িয়া গেল। এক ঝটকায় নিজকে মুক্ত করিয়া মায়া কন্দটা আবার তুলিয়া লইল। তাহার ভ্রূভঙ্গী, তাহার মুচকি হাসি, তাহার আহ্বানময় প্রত্যাখ্যান অপরূপ! নটবর পাগল হইয়া উঠিল। নটবর—। সহসা কঠিন প্রস্তরাঘাতে সচকিত হইয়া নটবর ফিরিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, বৈদ্যনাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে—ঘূর্ণিত-লোচন, হিংস্র-দংষ্ট্রা। নটবর ছুটিয়া গিয়া বৈদ্যনাথকে আক্রমণ করিল। পিতা-পুত্রে ঘোরতর দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইয়া গেল।

বৃদ্ধ বৈদ্যনাথ যুবক নটবরকে বিধ্বস্ত করিতে পারিল না। নটবরের

দেহে অসুরের শক্তি। সে বৈদ্যনাথকে ভূশায়ী করিয়া মায়াকে তাড়া করিল। মায়া ছুটিল, নটবরও ছুটিল। ছুটিতে ছুটিতে উভয়ে পর্ব্বত-গুহামুখে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কেহ বিশেষ বিচলিত হইল না।

প্রৌঢ়া জননী শেফালির নগ্নমূর্ত্তি যুবক পুত্র নরেশকে বিচলিত করিতেছিল বটে, কিন্তু অধিকতর উত্তেজনাজনক আর একটা ঘটনা ঘটিল। স্বচ্ছ নদীজলে একটা মৎস্য দেখিতে পাইয়া নরেশ জলে নামিয়া পড়িল, ডুব-সাঁতার কাটিয়া মাছটাকে ধরিতে হইবে। প্রকাণ্ড মাছ।

ভূপাল বালুকা খনন করিয়া কতকগুলি কচ্ছপের ডিম আবিষ্কার করিয়াছিল, সেগুলি আহরণ করিয়া অগ্নিকুণ্ড-সমীপে আসিয়া উপবেশন করিল এবং মনোনিবেশসহকারে সেগুলি আহার করিতে লাগিল। অশোক কয়েকটি কাড়িয়া লইল। একটু কলহ হইল। ধীরেন অগ্নিকুণ্ডে দহমান মূষিকগুলিকে আর একবার উলটাইয়া দিল।

অরুণ ও নিভার আর একবার দৃষ্টি-বিনিময় হইল। স্নেহলতা একটি চামড়া শেষ করিয়া আর একটি শুরু করিল।

সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত রহিল। বিধ্বস্ত বৈদ্যনাথ অথবা গুহান্তরালে অন্তর্হিত মায়া-নটবরকে লইয়া কেহই চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না। রুগ্ন টুকুর একটানা কান্নাতেও এতটুকু ছেদ পড়িল না।

চার

একটু পরে বৈদ্যনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল।

মায়া নটবর এখনও নিরুদ্দিষ্ট।

চতুর্দ্দিকে কোন শব্দ নাই।

কেবল টুকুটা কাঁদিতেছে। একটানা কান্না।

বৈদ্যনাথের দেহের সমস্ত পেশী আবার শক্ত হইয়া উঠিল। সে সহসা ছুটিয়া গিয়া টুকুকে তুলিয়া তাহার দুই পা ধরিয়া কঠিন পাথরটায় উপর সজোরে আছাড় মারিল। টুকুর মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল, রক্তাক্ত মস্তিষ্কটা ছ্যাতরাইয়া পাথরটার চতুর্দ্দিকে ছিটকাইয়া পড়িল। মৃতদেহটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বৈদ্যনাথ হাঁপাইতে লাগিল। ইহাতেও বিশেষ কেহ বিচলিত হইল না।

টুকুর মা থাকিলে হয়তো হইত। কিছুদিন পূর্ব্বে সে মারা গিয়াছে।

নিমাই উঠিয়া গিয়া টুকুর মৃতদেহটা আনিয়া একটা অগ্নিকুণ্ডে গুঁজিয়া দিল। এতখানি মাংস নষ্ট করিয়া কি হইবে!

অরুণ উঠিয়া নিভার কাছে গেল।

সিক্তদেহ নরেশ নদী হইতে উঠিল। মাছ ধরিয়াছে, প্রকাণ্ড মাছ।

তীরে উঠিয়াই সে মাছটাকে এক আছাড় দিল, তাহার পর তুলিয়া তাহার টুঁটিটা কামড়াইয়া ধরিল। মাছটা তবু ছটফট করিতেছে। নরেশ মাছটা খাইতে খাইতে একবার শেফালির দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর তাহার কাছে গিয়া বসিল। একেবারে গা ঘেঁষিয়া বসিল।

নদীর পরবর্ত্তী অরণ্যে কলরব উগ্র হইতে উগ্রতর হইতে লাগিল।

শেফালি নরেশের দিকে চাহিয়া হাসিল।

বাড়াবাড়ি ঠেকিতেছে?

ঠেকিবারই কথা। নামগুলা মুছিয়া দিয়া সময়টাকে আর একটু পিছাইয়া দিন, সব ঠিক হইয়া যাইবে। নদী-পরপারবর্ত্তী বনে যে কলরব-কোলাহল উঠিতেছে, তাহা আর কিছু নয়, আমাদের আদিম পূর্ব্বপুরুষেরা বন্য ম্যামথ শিকার করিতেছে।

কাল-চক্র ঘুরিতেছে।

ক খ গ

[জ্যামিতিক গল্প]

এক

ক ও খ অভিন্নহৃদয় বন্ধু।

শুধু তাহাই নহে, উভয়েরই জীবনের গতিপথ বৃত্তাকার। ধার করে, ধার করিয়া ধার শোধ করে, আবার ধার করে। জীবনের গতিপথ বৃত্তাকার হইলেও ইহাদের সান্ধ্যগতিপথ সরলরেখাকৃতি। সন্ধ্যার সময় উভয়েই সোজা এক স্থানে গমন করে এবং সমস্ত রাত্রি সেখানে অতিবাহিত করিয়া সকালে আবার ফিরিয়া আসে। রাত্রেই যেদিন ফিরিতে হয়, সেদিন অবশ্য গতিপথটা সরল থাকে না, একটু এঁকা-বেঁকা হইয়া যায়।

ধার বাড়ে।

জীবন অর্থহীন হইয়া পড়িতে চায়। আবার নূতন অর্থ মেলে।

ক বস্তুতান্ত্রিক।

খ ভাবতান্ত্রিক।

খ পরিচিত-মহলে কখনও বক্তৃতা দিয়া, কখনও কাঁদিয়া-কাটিয়া কখনও অভিনয় করিয়া কাজ হাসিল করে। সোজা চাহিয়া না পাইলে ক পকেট মারে। বস্তুতান্ত্রিক ক।

দুই

গ।

ষোড়শী গ। কয়ের কন্যা। মাতৃহীনা একমাত্র কন্যা। তবু অনূঢ়া। তাহার অন্তরের কামনা সর্ব্বাঙ্গে প্রকট।

বস্তুতান্ত্রিক ক দেখে, বোঝে, কিন্তু কিছু করিতে পারে না। এত লম্বা পকেট বঙ্গদেশে কাহারও নাই, যাহা মারিয়া পণের টাকা সংগ্রহ করা যায়।

ক ও গ দুইজনের নিশ্বাস পড়ে।

খ আসে।

ক খ গ ত্রিভুজ নয়,—পিতা, পিতৃবন্ধু ও কন্যা।

ক খ বাহির হইয়া পড়ে, সোজা সরলরেখায় সেই স্থানে যায়, যেখানে গেলে চতুর্ভুজ হওয়া সম্ভব।

তিন

ভাবতান্ত্রিক গ।

মনে ভাব জাগে, ভাষা মেলে না।

কবিতা লিখিতে চায়, মিল জোটে না।

গোলাপের সহিত জোলাপ ছাড়া অন্য মিল আসে না।

না—না—না। সমস্ত জীবনটাই না।

তবু—আকাশে রামধনু উঠে—সাতটা নয়, সাতশো রঙ।

খয়ের অন্তর খলখল করে।

দিন কাটে।

চার

দুই মাস কাটিয়া গেল।

সানাই বাজিতেছে। করুণ পূরবী সন্ধ্যার আকাশে কাঁদিয়া ফিরিতেছে। পাড়ায় মিত্রদের মেয়ের বিবাহ।

নিজের বাসায় ক বসিয়া আছে—বস্তুতান্ত্রিক ক—খয়ের অপেক্ষায়।

পূরবী তাহাকে মুগ্ধ করিতেছে না, বিলম্ব তাহাকে ক্ষুব্ধ করিতেছে। খ এত দেরি করিতেছে কেন? দেরি হইলে আবার—

আধ ঘণ্টা কাটিল, এক ঘণ্টা কাটিল।

শালা—

ক্ষুব্ধ ক উঠিয়া বাহির হইয়া গেল।

আজ একাই যাইবে সে।

পূরবী বাজিতেছে।

গয়ের বুক ভাঙিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

পাঁচ

ঘণ্টাখানেক পরে ক ফিরিল।

খুব বিরক্ত হইয়া ফিরিল, বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছে। সেখানে দ্বার বন্ধ। আসিয়া আরও বিরক্ত হইল। বিস্মিতও হইল। এখানেও ঘরে খিল কেন?

ধাক্কা দিল।

একবার, দুইবার, তিনবার।

লজ্জিতা গ খিল খুলিয়া দিল।

বিছানায় খ বসিয়া আছে।

ক ও খ নির্নিমেষে পরস্পরের প্রতি মুহূর্ত্তকাল চাহিয়া রহিল—মুহূর্ত্তকাল মাত্র।

তারপর সহসা ক বাহির হইয়া গেল।

যাইবার সময় শিকল তুলিয়া তালা দিয়া গেল। ভীতা গ খকে বলিল, তুমি জানলা দিয়ে পালাও।

লোহার গরাদে আছে যে!

আরও ঘণ্টাখানেক পরে ক ফিরিল—বস্তুতান্ত্রিক ক।

সঙ্গে পুরুত।

কর্ শালা, বিয়ে কর্।

খ রাজি হইয়া গেল।

সানাই তখন ইমন ধরিয়াছে।

তপন

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

বলিষ্ঠগঠন ব্যক্তিটি নিঃশব্দ-নিপুণতা-সহকারে বাতায়নপথে প্রবেশ করিল। দীর্ঘ দেহ, অবিন্যস্ত রুক্ষ চুল, ঘনকৃষ্ণ চাপ-দাড়ি। চপলা নিবিষ্ট চিত্তে পড়িতেছিল। লোকটি নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

চপলা, আমি এসেছি।

চপলা চীৎকার করিতে গিয়া থামিয়া গেল। সে হঠাৎ তপনকে চিনিতে পারিল।

তপন! তুমি! এতদিন পরে!

হ্যাঁ, দশ বছরের অক্লান্ত চেষ্টা আজ সফল হয়েছে, আজই জেল থেকে পালিয়েছি। আর দেরি ক'রো না, চল শিগগির।

কোথায়?

প্ল্যান ঠিক ক'রে ফেলেছি। প্রথম চাটগাঁ, তারপর রেঙ্গুন, তারপর পাহাড় পেরিয়ে—

চপলা চুপ করিয়া রহিল।

তপন হাসিল।

তোমার সিঁদুরটা দেখতে পেয়েছি। জেলে ব'সেই খবর পেয়েছিলাম। তুমি বীরের গলায় মালা দেবে বলেছিলে না? অবশ্য তোমার স্বামীও কম বীর নন; রায়সাহেব হওয়া সোজা কথা নয়।

তুমি অমন ক'রে ঠাট্টা ক'রো না। তোমাকে কথা দিয়েছিলাম, তোমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকব, সে প্রতিশ্রুতি আমি রাখতে পারি নি। আমায় ক্ষমা কর তুমি।

তপন সস্মিত মুখে চাহিয়া রহিল। ইহারই প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া, ইহারই চক্ষে নিজেকে মহনীয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য দেশের কাজে সে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিল। চপলার বয়স সহসা যেন দশ বছর কমিয়া গেল, অতীত-যৌবনের অবলুপ্ত উন্মাদনা আবার অকস্মাৎ যেন তাহার দেহে মনে ফিরিয়া আসিল।

আমি যদি যাই, আমাকে নিয়ে যাবে?

সেইজন্যেই তো এসেছি। কিন্তু রায়সাহেবটি?

ওঁর অবশ্য কষ্ট হবে খুব। আর তা ছাড়া—

সহসা চপলা থামিয়া গেল।

তা ছাড়া কি?

বিয়ের আগে তোমার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ছিল, সব উনি জানেন।

কি ক'রে জানলেন?

আমিই বলেছিলাম।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া চপলা বলিল, তুমি জেল থেকে পালিয়েছ, আমিও যদি পালাই, উনি সব বুঝতে পারবেন, আর তা হ'লে হয়তো—

চপলা কথাটা শেষ করিল না।

তপন বলিল, তা হ'লে হয়তো ওঁর চেষ্টায় অবিলম্বে ধরা প'ড়ে যাব আমরা। অবশ্য তোমার যদি আপত্তি না থাকে, সে বিষয়ে নিষ্কণ্টক এখনই হতে পারি। পকেট হইতে রিভল্‌ভারটা টানিয়া সে দেখাইল। তোমার স্বামী ক্লাব থেকে কোন্ পথে ফিরবেন তা জানি।

চপলা চুপ করিয়া রহিল।

বল, রাজি আছ?

চপলা নির্নিমেষে তপনের মুখের পানে চাহিয়া ছিল।

মৃদুকণ্ঠে বলিল, আছি।

এতদিন যার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে একত্র বাস করলে, তাকে এত সহজে ছেড়ে যাবে? যেতে পারবে?

চপলা তাহার মুখের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তপন এ কি বলিতেছে? সে কি জানে, তাহার জন্য কত বিনিদ্র রজনী সে যাপন করিয়াছে? সে কি বুঝিতে পারিবে, কিসের তাড়নায়, কিসের জ্বালায় সমাজের নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রে সে বিবাহ করিয়াছে? নারীর ব্যথা, নারীর দুর্ব্বলতা, নারীর সমস্যা, নারীহৃদয়ের দুর্ব্বোধ্য জটিলতার কতটুকু জানে সে? কতটুকু বোঝে? বিবাহ করিয়াছে বলিয়াই তপন পর হইয়া যাইবে? তপনই তো তাহার স্বামী, তপনই তো তাহার আরাধ্য দেবতা। সে স্বয়ং আসিয়াছে, তাহাকে ফিরাইয়া দিবে?

তপন পুনরায় প্রশ্ন করিল, যেতে পারবে?

পারব।

চপলার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল।

রায়সাহেবকে শেষ ক'রে আসছি তা হ'লে।

তপন চলিয়া গেল।

এক ঘণ্টা পরে দ্বারপথে শব্দ হইল।

তড়িৎস্পৃষ্টবৎ চপলা উঠিয়া দাঁড়াইল।

দ্বার ঠেলিয়া রায়সাহেব প্রবেশ করিলেন, তপন নয়। তপন আর ফিরিল না।

করুণা-ভাজন

এক

চৈত্র মাস। রৌদ্রের তেজ বেশ বাড়িয়াছে। দ্বিপ্রহরে উত্তর দিকের বারান্দার কোণটা শীতল। ভূরিভোজনান্তে একটি কেদারায় অঙ্গ প্রসারিত করিয়া সেই কোণটি আশ্রয় করিয়াছি। হস্তে খবরের কাগজ আছে, তন্দ্রাবিষ্ট নয়নে মনুষ্যজাতির পাশবিকতার কথা পাঠ করিয়া বর্ত্তমান সভ্যতার ভব্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিতেছি, মনে হইতেছে, আমরা ভারতবাসীরা কোন কারণেই বোধ হয় এমন নৃশংস বর্ব্বর হইয়া উঠিতে পারিব না, যে প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি আমাদের শোণিতধারায়—। হঠাৎ কাগজটা হাত হইতে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হইয়া উঠিয়া বসিলাম। ঢুল ধরিয়াছিল। উঠিয়া বসিতেই নজর পড়িল, সম্মুখের তপ্ত পথ দিয়া জীর্ণমলিনবসনপরিহিত একজন পথিক একটা প্রকাণ্ড বস্তা মাথায় করিয়া পথ অতিবাহন করিতেছে। দুঃখ হইল। এই দারুণ রৌদ্র, মাথায় অতবড় বস্তা! নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলাম। লোকটি আমার বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া আর পারিল না, বস্তাটা মাথা হইতে নামাইয়া রাখিয়া হাঁপাইতে লাগিল। অদ্ভুত চেহারা! মাথায় রুক্ষ চুল, মুখময় কাঁচা-পাকা গোঁফ-দাড়ি, চোখে নিকেলের চশমা, মাথায় পাগড়ি, গায়ে জামা নাই, খালি পা।

হঠাৎ—এ কি! খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিলাম। শেষটা উঠিয়া দাঁড়াইতে হইল। বস্তাটা নড়িতেছে! বেশ নড়িতেছে। গেট খুলিয়া বাহির হইয়া গেলাম। কাছে গিয়াও দেখিলাম, সত্যই নড়িতেছে। বস্তার মুখ কষিয়া বাঁধা, ভিতরে কি আছে দেখা যায় না।

কি আছে ওর ভেতর ?

কুকুরবাচ্চা।

কুকুরবাচ্চা ?

হ্যাঁ। কুড়িটা কুকুরবাচ্চা।

বেশ নির্ব্বিকারভাবে উত্তর দিল।

বস্তায় কুকুরবাচ্চা পুরেছ কেন ?

রাত্রে ঘুমুতে দেয় না, বড় বিরক্ত করে। গঙ্গায় ফেলে দিতে যাচ্ছি।

বল কি ?

বস্তাটা আর একবার নড়িয়া উঠিল।

পাগল নাকি তুমি ? খুলে দাও।

বড্ড বিরক্ত করে বাবু।

বস্তাটা আবার নড়িল।

দম বন্ধ হয়ে ম'রে যাবে যে এই গরমে ! খুলে দাও শিগগির।

নিজেই হেঁট হইয়া বস্তার মুখটা খুলিতে লাগিলাম। লোকটা বাধা দিল না। কোমরে হাত দিয়া ঘাড়টা একটু কাত করিয়া স্মিত মুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। রাস্তায় লোক জমিয়া গেল। দুই-একজন বলিল, লোকটা সত্যিই পাগল। ভিন্ন গ্রামে থাকে।

দুই

কাঁই কাঁই কাঁই কাঁই—কেঁউ কেঁউ কেঁউ কেঁউ—

কুড়িটা কুক্কুরশাবকের আর্ত্ত কণ্ঠ নৈশ অন্ধকারকে বিঘ্নিত করিতেছে। প্রত্যেক শাবকটিই সবেগে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া সজোরে ভূমিতে নিপতিত হইতেছে। নিপাতিত করিতেছি আমিই। শুইতে গিয়া দেখি, কুড়িটাই আমার বিছানায় কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া আছে। কি আপদ!

লাল বনাত

শত্রুপক্ষের লোকেরা সবিস্ময়ে দেখিল, রায় মহাশয় অদ্ভুত বেশে সজ্জিত হইয়া সাক্ষী দিতে আসিয়াছেন। গায়ে টকটকে লাল বনাতের কোট, মাথায় ধপধপে সাদা রেশমের পাগড়ি, অবিচলিত গাম্ভীর্য্যের সহিত সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া সাক্ষী দিতেছেন। তিন বৎসর আত্মগোপন করিবার পর আজ এই প্রথম তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। সাতটি ফৌজদারী মকদ্দমায় তিনি আসামী -- সাতটি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তাঁহার নামে জারি হইয়াছে; কিন্তু অদ্যাবধি তিনি অধৃত। আজ এই প্রকাশ্য আদালতে তাঁহার আবির্ভাবের গুরুতর হেতু আছে। স্বয়ং আসিয়া সাক্ষী না দিলে একটি প্রকাণ্ড মকদ্দমায় তিনি পরাজিত হইবেন, তাঁহার সম্পত্তির অর্দ্ধেক বেহাত হইয়া যাইবে। সুতরাং তাঁহাকে আসিতে হইয়াছে।

শত্রুপক্ষের লোকেরা পুলিস-সমভিব্যাহারে আদালতের বারান্দায় সাগ্রহে অপেক্ষমান, সাক্ষী দিয়া বাহির হইলেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে। ঠিক বারান্দার নীচেই একটি তেজস্বী অশ্ব গ্রীবা বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছে। রায় মহাশয়ের ঘোড়া। পুলিস-সাহেবের ঘোড়াও অদূরে দাঁড়াইয়া আছে।

রায় মহাশয় সাক্ষী দিয়া বারান্দায় বাহির হইলেন এবং নিমেষের মধ্যে বারান্দার উপর হইতেই একলম্ফে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। অশ্ব বিদ্যুদ্বেগে বাহির হইয়া গেল।

পুলিস প্রথমটা হতভম্ব হইয়া পড়িল, তাহার পর একজন দারোগা পুলিস-সাহেবের ঘোড়াটা লইয়া আসামীর অনুসরণ করিলেন। রায়

মহাশয় আগাইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুদূর গিয়াই লাল বনাতের কোট গায়ে মাথায় সাদা পাগড়ি অশ্বারোহীকে দেখিতে পাওয়া গেল। অশ্ব তীরবেগে ছুটিতেছে। দারোগাও ঘোড়ার গতিবেগ বাড়াইলেন। বন্ধুর মসৃণ ছোট বড় বহুবিধ প্রান্তর পার হইয়া রায় মহাশয়ের অশ্ব অবশেষে একটা বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ পরে দারোগার অশ্বও প্রবেশ করিল। বন অতিক্রম করিয়া আবার একটা মাঠ। মাঠে পড়িয়া দারোগা রায় মহাশয়কে পুনরায় দেখিতে পাইলেন—উদ্দাম বেগে ঘোড়া ছুটিতেছে। তিনিও ঘোড়াকে সজোরে কয়েকবার কশাঘাত করিলেন। কিছুক্ষণ ছুটিবার পর দারোগার মনে হইল, বিধি প্রসন্ন হইয়াছেন। রায় মহাশয়ের ঘোড়ার পেটি খুলিয়া গিয়াছে এবং তাহা ঠিক করিবার জন্য তাঁহাকে নামিতে হইয়াছে। উর্দ্ধশ্বাসে দারোগা অকুস্থলে আসিয়া পৌছিলেন; রায় মহাশয়ের ঘোড়ার পেটি তখনও ভাল করিয়া বাঁধা হয় নাই।

দারোগা ঘোড়া হইতে নামিয়া গ্রেপ্তার করিতে গিয়া কিন্তু বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলেন। রায় মহাশয় নয়। দারোগার বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষু দেখিয়া অপরিচিত লোকটা নীরবে দন্তপংক্তি বিকশিত করিয়া হাসিল।

বনের মধ্যে অশ্বারোহী বদল হইয়া গিয়াছে।

ছোটলোক

উন্নতমস্তক রাঘব সরকার দ্বিপ্রহরে নিদারুণ রৌদ্র উপেক্ষা করিয়া দ্রুতপদে পথ চলিতেছিলেন। তাঁহার পরিধানে খদ্দর, মাথায় ছাতা নাই, পায়ে জুতা অবশ্য আছে, কিন্তু তাহা এমন কণ্টকসঙ্কুল যে, বিক্ষত পদদ্বয়কে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের মর্য্যাদা দিলে খুব বেশি অন্যায় হয় না। উন্নতমস্তক রাঘব সরকারের কিছু ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি দ্রুতপদেই চলিয়াছেন। সুনির্দ্দিষ্ট-নীতি-অনুসরণকারী অনমনীয়-চরিত্র রাঘব সরকার চিরকালই উন্নতমস্তক। তিনি কখনও কাহারও অনুগ্রহের প্রত্যাশী নহেন, কাহারও স্কন্ধারূঢ় হইয়া থাকেন না, যথাসাধ্য সকলের উপকার করেন, পারতপক্ষে কাহারও দ্বারা উপকৃত হন না। স্বকীয় মস্তক সর্ব্বদা উন্নত রাখাই তাঁহার জীবনের সাধনা।

ঠুনঠুন করিয়া ঘণ্টা বাজইয়া এক রিক্‌শাওয়ালা তাঁহার পিছু লইল।

রিক্‌শা চাই বাবু, রিক্‌শা?

রাঘব একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন। অস্থিচর্ম্মসার লোকটা তাঁহার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। যাহারা নিতান্ত অমানুষ, তাহারাই মানুষের কাঁধে চড়িয়া যায়—ইহাই রাঘবের ধারণা। তিনি জীবনে কখনও পালকি অথবা রিক্‌শা চড়েন নাই, চড়া অন্যায় মনে করেন। খদ্দরী আস্তিন দিয়া কপালের ঘামটা মুছিয়া বলিলেন, না, চাই না।

দ্রুতপদে হাঁটিতে লাগিলেন।

ঠুনঠুন করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া রিক্‌শাওয়ালাটাও পিছু পিছু আসিতে

লাগিল। সহসা রাঘব সরকারের মনে হইল, বেচারার ইহাই হয়তো অন্নসংস্থানের একমাত্র উপায়। রাঘব কৃতবিদ্য ব্যক্তি, সুতরাং তাঁহার মস্তিষ্কে ধনিকবাদ, দরিদ্র-নারায়ণ, বল্‌শেভিজ্‌ম্‌, ডিভিশন অব লেবার, পল্লীর দুর্দ্দশা, ফ্যাক্টরি, জমিদারি, অনেক কিছুই নিমেষের মধ্যে খেলিয়া গেল। তিনি আর একবার পিছু ফিরিয়া চাহিলেন। আহা, সত্যই লোকটা জীর্ণশীর্ণ অনাহারক্লিষ্ট! হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল।

ঘণ্টা বাজাইয়া রিক্‌শাওয়ালা আবার বলিল, চলুন না বাবু, পৌঁছে দিই। কোথায় যাবেন?

ওই শিবতলা পর্য্যন্ত যেতে ক পয়সা নিবি?

ছ পয়সা।

আচ্ছা, আয়।

রাঘব সরকার চলিতে লাগিলেন।

আসুন বাবু, চড়ুন।

তুই আয় না।

রাঘব সরকার গতিবেগ বাড়াইয়া দিলেন।

রিক্‌শাওয়ালা পিছু পিছু ছুটিতে লাগিল।

মাঝে মাঝে কেবল নিম্নলিখিতরূপ বাক্য-বিনিময় হইতেছে।

আসুন বাবু, চড়ুন।

আয় না।

শিবতলায় পৌঁছিয়া রাঘব সরকার পকেট হইতে ছয়টি পয়সা বাহির করিয়া বলিলেন, এই নে।

আপনি চড়লেন কই?

আমি রিক্‌শা চড়ি না।

কেন?

রিক্‌শা চড়া পাপ।

ও। তা আগে বললেই পারতেন!

লোকটার চোখে মুখে একটা নীরস অবজ্ঞা মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। সে ঘাম মুছিয়া আবার চলিতে শুরু করিয়া দিল।

পয়সাটা নিয়ে যা।

আমি কারও কাছ থেকে ভিক্ষে নিই না।

ঠুনঠুন করিয়া ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে সে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ইতিহাস

অনেক অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত ইতিহাস অবগত হইয়াছি। সংক্ষেপে তাহা এই। গল্পাকারে বলিতেছি।

একদা জনৈক সর্ব্বহারা নিষাদ ইতস্তত পরিভ্রমণ করিতে করিতে তমসা-তীরে আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। এই নিষাদ এখন যদিও সর্ব্বহারা, কিন্তু একদিন তাঁহার সব ছিল। বহু পত্নী, বহু গাভী, বহু বৃষ, বহু মেঢ্র, বহু কুক্কুর, বহু আরণ্য-সম্পত্তি, কিছুরই তাঁহার অভাব ছিল না। বস্তুত ইনিই একদা তরক্ষু-রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি সর্ব্বহারা—ধনুর্ব্বাণ ছাড়া আর কিছুই নাই।

সহসা মনে হইতে পারে যে, অত্যাচারী আর্য্যগণ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়াই বুঝি ইনি দুর্দ্দশা-সাগরে নিপতিত হইয়াছেন। তৎকালে আর্য্যগণ অনার্য্যগণকে লাঞ্ছিত করিয়া হর্ষ-বোধ করিতেন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই নিষাদ ভদ্রলোকের সহিত তাহাদের সদ্ভাব ছিল। এমন কি, এইজন্যই অন্যান্য নিষাদগণ তাঁহাকে আর্য্যপদলেহী গৃহশত্রু বলিয়া সন্দেহ করিতেন এবং এইজন্যই সম্ভবত তাঁহার পত্নী গদ্‌গদা শবররাজ কিংকুর প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন। গদ্‌গদা এবং কিংকু উভয়েরই স্বজাতিপ্রীতি অসাধারণ ছিল।

প্রকৃত কারণ যাহাই হউক, গদ্‌গদা এবং কিংকুর ষড়যন্ত্রেই তরক্ষুরাজ বিপন্ন হইলেন। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, ধনুর্ব্বাণ মাত্র সম্বল করিয়া তাঁহাকে রাজ্যত্যাগ করিতে হইল। চিরাচরিত প্রথানুসারে তরক্ষুরাজ শ্মশানচারী যাদুকর চেম্বার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। চেম্বার অভিমত, বুদ্ধিভ্রংশই তাঁহার অধঃপতনের কারণ। পুনরায় বুদ্ধিমান

হইবার উপায়ও চেম্বা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু অভীষ্ট বস্তুটি কিছুতেই মিলিতেছে না। এতদ্দিন কত কান্তারে, কাননে, প্রান্তরে, নদীতটে তিনি পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু কই! সহসা নিষাদের চক্ষুর্দ্বয় প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল।

ওই তো এক জোড়া কামক্রীড়াপরায়ণ কোঁচ-বক?

তৎক্ষণাৎ নিষাদ হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িলেন এবং ধনুতে শরযোজনা করিয়া কামোন্মত্ত পুংবকের হৃদয়-দেশ বিদীর্ণ করিয়া সোল্লাসে লাফাইয়া উঠিলেন। বকী উড়িয়া গেল।

চেম্বার ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হইবার নহে।

রতিক্রীড়াপরায়ণ পুংবকের মাংস ভক্ষণ করিবামাত্র নিষাদের সুপ্ত বুদ্ধি যেন জাগরিত হইয়া উঠিল। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া প্রতাপশালী আর্য্যগণের দ্বারস্থ হইলেন। আর্য্যগণ চিরকাল আশ্রিত-বৎসল ও ন্যায়পরায়ণ। সুতরাং তাঁহারা শবররাজের বিরুদ্ধে ন্যায়-যুদ্ধ ঘোষণা করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিলেন না।

ভয়ানক যুদ্ধ হইল। শতযোজন ব্যাপিয়া দিবারাত্রি যুদ্ধ। আকাশে বাতাসে কেবল কাড়া-নাকাড়া-দামামা-ভেরীর শব্দ; চতুর্দ্দিকে ছিন্ন মুণ্ড, কর্ত্তিত হস্ত, বিচ্ছিন্ন পদ, বিদীর্ণ উদর, বিকৃত কবন্ধের স্তূপ; গ্রামে গ্রামে প্রজ্বলিত গৃহ, পথে-বিপথে পলায়নপর নরনারী, ধাবমান সৈন্যসামন্ত, ক্রন্দনে কলরবে দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ।

তরক্ষুরাজ-কণ্ঠেই বিজয়লক্ষ্মী বরমাল্য দান করিলেন।

রণক্ষেত্রে কিংকুর চক্ষু উৎপাটন ও হৃদয় বিদারণ করিয়া নিষাদের প্রতিহিংসা কথঞ্চিৎ শান্ত হইল। গদ্‌গদার ব্যবস্থা গৃহে হইবে। রথারোহী হইয়া তিনি নিষ্কণ্টক রাজ্যে সদম্ভে পুনঃপ্রবেশ করিলেন—রথের পশ্চাতে গদ্‌গদার চুলের ঝুঁটি বাঁধা। প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া

তরক্ষুরাজ গদ্‌গদাকে একটি ন্যগ্রোধবৃক্ষের কাণ্ডে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিলেন এবং তৎপরে তাহার অনাবৃত দেহে শঙ্কর-মৎস্যোৎপন্ন কশাদ্বারা অবিরাম আঘাত করিতে লাগিলেন। শাসন সমাপ্ত হইলে নদীজলে কয়েকবার চুবাইয়া তৎপর তাহাকে অন্তঃপুরে স্থান দিলেন।

এই ব্যাপার হইতেই সতীত্ব জিনিসটির উদ্ভব এবং ইহার পর হইতেই আর্য্যসভ্যতার বিস্তার। তরক্ষুরাজের সহায়তা ভিন্ন আর্য্যসাম্রাজ্যের এত দ্রুত বিস্তার হইত না।

সংক্ষেপে ইহাই প্রকৃত ইতিহাস।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ইতিহাসে ইহার কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। এ সম্পর্কে ইতিহাসে যেটুকু উল্লেখ আছে, তাহা সামান্য এবং ইতিহাসের দিক দিয়া অতিশয় হাস্যকর। শরাহত পুংবককে দেখিয়া বাল্মীকি নামক জনৈক বুড়া ব্রাহ্মণ নাকি দুই ছত্র সংস্কৃত শ্লোক লিখিয়াছিলেন!

আশ্চর্য্য!

গণেশ

গল্পটি আপনার মনে হাস্য অথবা করুণ, কি রস উদ্রিক্ত করিবে, তাহা আপনার মনের উপর নির্ভর করে। গল্পটি এই—

গণেশের গল্প। গণেশ নিতান্তই সাধারণ মানুষ। তাহার সামান্য যাহা বিশেষত্ব, তাহা তাহার চেহারায়। রগের শিরাগুলি স্ফীত, চক্ষু দুইটি বহির্মুখী, দেখিলেই মনে হয়, লোকটা যেন দম বন্ধ করিয়া রহিয়াছে। গ্রীবা বলিয়া কোন অঙ্গই নাই যেন, ধড়ের উপর প্রকাণ্ড মাথাটি বসানো। এই গণেশ একবার অসুখে পড়িয়াছিল। জ্বর নয়, হঠাৎ মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। দশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী শহর হইতে বড় ডাক্তার আসিয়াছিলেন এবং যন্ত্রের সাহায্যে গণেশের রক্তের চাপ পরীক্ষা করিয়া চমকিত হইয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন যে, এত অল্প বয়সে এত বেশি ব্লাড-প্রেসার তিনি আর কখনও দেখেন নাই। বহুদর্শী ডাক্তারবাবুর উপদেশ অনুসারে নানারূপ ঔষধ-পথ্য সেবন করিয়া গণেশ সে যাত্রা প্রাণে বাঁচিল বটে, কিন্তু জেরবার হইয়া গেল। তরুণী ভার্য্যা বিভাবতীর বালা জোড়াটি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে হইল।

এইখানেই গল্পের শুরু।

সুস্থ হইয়াও গণেশ কেমন যেন অসুস্থ বোধ করিতে লাগিল। ঔষধ-পথ্যের গুণে সাময়িকভাবে রক্তের চাপ কিছু কমিয়া থাকে, কিন্তু বিভাবতীর হাতের পানে চাহিলে তাহার বুকের ভিতরটা হু-হু করিয়া উঠে, রক্তের চাপও হু-হু করিয়া বাড়িয়া যায়। গরিব গণেশের পক্ষে মূল্যবান ডাক্তারবাবুর পুনরায় নাগাল পাওয়া অথবা তাঁহার মূল্যবান

উপদেশ বরাবর অনুসরণ করা কোনটাই সম্ভবপর নয়, সুতরাং বর্দ্ধিত-রক্ত-চাপ অবস্থাতেই তাহার দিন কাটিতে লাগিল।

এইভাবেই চলিতেছিল।

এমন সময় একদিন একটা কাণ্ড হইয়া গেল। কাণ্ড এমন কিছু নয়, কিন্তু গণেশের তাহা শুধু কাণ্ড নয়, প্রকাণ্ড বলিয়া মনে হইল। গণেশ প্রত্যহ প্রাতঃকালে কাজে বাহির হইয়া যায়। পাশের গ্রামে আঢ্যিদের কাপড়ের দোকানে সে কাজ করে। ফেরে রাত্রি দশটা-এগারোটায়। বিভাবতী বাড়িতে একাই থাকে। কারণ গণেশের তিন কুলে কেহ নাই।

একদিন রাত্রে গণেশকে ভাত দিতে দিতে বিভাবতী বলিল, আজ দাদা এসেছিল।

ও, তাই নাকি? ধ'রে রাখলে না কেন, আমার সঙ্গে দেখাটা হ'ত।

বললাম তো কত ক'রে, রইল না কিছুতে, জরুরী কাজ আছে নাকি একটা, তাই চ'লে গেল।

গণেশ নীরবে কয়েক গ্রাস ভাত মুখে পুরিল।

কি কি গল্প হ'ল?

এই সব আর কি।

একটু থামিয়া মুচকি হাসিয়া বিভাবতী বলিল, আমার বালা জোড়ার কথা জিজ্ঞেস করছিল।

গণেশের চোখ দুইটা যেন আরও খানিকটা বাহির হইয়া আসিল।

কি জিজ্ঞেস করছিল?

বলছিল, হাত খালি কেন, বালা জোড়া কি হ'ল?

কি বললে তুমি?

বললাম, ভেঙে আবার গড়াতে দিয়েছি নতুন প্যাটার্নের।

ভাতের গ্রাসটা মুখে পুরিয়া গণেশ চিবাইতে লাগিল। তাহার রগের শিরাগুলা আরও যেন ফুলিয়া উঠিল।

মিছে কথা বলতে গেলে কেন, সত্যি কথা বললেই পারতে।

আমার লজ্জা করল।

একটু থামিয়া বিভাবতী আবার বলিল, বাপের বাড়িতে ছোট হতে যাব কেন, গড়িয়ে নিলেই হবে 'খন পরে।

গণেশ নীরব।

মুচকি হাসিয়া বিভাবতী বলিল, আর একটু ডাল দিই?

দাও।

ষোড়শী পত্নী বিভাবতীর পানে চাহিয়া গণেশের মনে সহসা কেমন যেন একটা মাধুর্য্য সঞ্চার হইল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, চচ্চড়িও দাও একটু, বেশ হয়েছে চচ্চড়িটা।

বিভাবতী চচ্চড়ি দিল। গণেশ নীরবে ডাঁটাগুলি চিবাইতে লাগিল।

আর ভাত দেব?

না।

দুধটা গরম ক'রে আনি।

বিভাবতী পাশের ঘরে গেল। ঘরের গরুটি আছে, তাই গণেশ দুধটুকু খাইতে পায়, দুধ কিনিয়া খাইবার সামর্থ্য তাহার নাই। খানিকক্ষণ পরে বিভাবতী দুধের বাটি লইয়া প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিতেই গণেশ বলিল, তা ঠিকই করেছ তুমি, গড়িয়ে নিলেই হবে 'খন পরে। তাহার পর হাত চাটিতে চাটিতে বলিল, ওদের কাছে ছোট হতে যাব কেন, ঠিক। তাহার পর বিভাবতীর খালি হাতের পানে আড়চোখে

একবার চাহিয়া দেখিয়া জলের গ্লাসটা তুলিয়া ঢকঢক করিয়া সমস্ত জলটা খাইয়া ফেলিল।

মাসখানেক কাটিল।

সেদিন কৃষ্ণপক্ষ। একটু রাত করিয়াই চাঁদ উঠিয়াছে। পূর্ব্বদিগন্তে একটা নীরব সমারোহ পড়িয়া গিয়াছে। যে মেঘগুলি এতক্ষণ অন্ধকারে অদৃশ্য ছিল, জ্যোৎস্নালোকে তাহারা স্বরূপ-দৃশ্য হইয়া উঠিতেছে। বকুলগাছের ফাঁক দিয়া এক ফালি জ্যোৎস্না গণেশের বিছানাতেও আসিয়া পড়িয়াছে। বিভাবতী ও গণেশ পাশাপাশি শুইয়া গল্প করিতেছে। তুচ্ছ গল্প, পাড়ার এর ওর তার কথা। হঠাৎ বিভাবতী বলিল, মিত্তিরদের বউ নতুন বালা গড়িয়েছে। আজ দেখতে গেসলাম, কি চমৎকার গড়েছে বিধু স্যাকরা, যেমন পালিশ তেমনই গড়ন, চোখ ঝলসে যায় একেবারে!

তাই নাকি?

গণেশের রগের শিরাগুলি ক্রমশ ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

হ্যাঁ, শিমুলকাঁটা প্যাটার্ন।

সে আবার কি রকম?

সে চমৎকার! শিমুলকাঁটার মত কাঁটা কাঁটা দেওয়া।

ও।

পালিশ চমৎকার খোলে।

গণেশ চুপ করিয়া রহিল।

একটু পরে বিভাবতী বলিল, একটা বিপদও আছে কিন্তু বাপু, কাঁটাগুলোর যা ধার, কাপড়-চোপড় ছিঁড়ে যেতে পারে।

গণেশ এবারও কিছু বলিল না। একটা দমকা বাতাস ঘরে ঢুকিয়া বকুলফুলের গন্ধে সমস্ত ঘরটা ভরিয়া দিয়া গেল।

ঘুমুলে নাকি ?

হ্যাঁ, ঘুম পাচ্ছে।

গণেশ পাশ ফিরিয়া শুইল, কিন্তু ঘুমাইল না। নীরবে চোখ বুজিয়া অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিল। তাহার পর হঠাৎ কখন এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল, স্বপ্ন দেখিল, যেন সে বিভাবতীকে শিমুলকাঁটা বালা গড়াইয়া দিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, তাহাকে লইয়া সে যেন শ্বশুর-বাড়ি গিয়াছে, বিভাবতী তাহার দাদাকে যেন বালা দেখাইয়া বলিতেছে—দেখ তো দাদা, এ প্যাটার্নটা সুন্দর নয় ?

পরদিন সে বিধু স্যাকরার সহিত দেখা করিল।

শিমুলকাঁটা বালা গড়াতে কত পড়বে হে বিধু ?

কত ভরির হবে ?

যাতে ভাল হয়।

ভাল ক'রে করতে গেলে শ দুই টাকা পড়বে।

দুশো !

গণেশের রগের শিরাগুলি দপদপ করিয়া উঠিল।

কয়েকদিন কাটিল।

অবশেষে অনেক ইতস্তত করিয়া মনিব দিগম্বর আঢ্যের নিকট সে কথাটা পাড়িল।

আমাকে শ দুই টাকা ধার দিতে হবে।

টাক-মাথা বেঁটে দিগম্বর আঢ্য কথাটা শুনিয়াই—যেমন তাঁহার অভ্যাস—চোখ হইতে চশমা খুলিয়া ফেলিলেন এবং ঘাড় হেঁট করিয়া কোঁচার কাপড় দিয়া কাচগুলি পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। গণেশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। চশমা পরিধান করিয়া দিগম্বর গণেশের মুখের দিকে তাকাইলেন।

ধার! তোমাকে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কি করবে অত টাকা দিয়ে?

জরুরী দরকার আছে একটা।

তা না হয় আছে বুঝলাম, কিন্তু শুধবে কি ক'রে?

মাইনে থেকে প্রতি মাসে কাটিয়ে দেব।

মাইনে তো পাও দশটি টাকা, তার থেকে আর কত কাটাবে তুমি? পাগলা, না ক্ষ্যাপা!

ইহা সত্য কথা। গণেশ চুপ করিয়া রহিল।

গয়না-টয়না যদি বন্ধক রাখতে পার কিছু, দিতে পারি।

খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া গণেশ কাজে চলিয়া গেল।

পুনরায় একদিন বিভাবতীর দাদা আসিয়া উপস্থিত। গণেশ তখন বাড়িতে ছিল।

নেমন্তন্ন করতে এলুম। সুবির বিয়ে।

কবে?

মাঝে আর দশটা দিন আছে।

সুবি বিভাবতীর ছোট বোন।

যেও কিন্তু, না গেলে মা দুঃখিত হবে বড়, গাড়ি একটা ভাড়া ক'রে যেও, সেখান থেকে পাঠানোর বড় হাঙ্গামা, ভাড়া দিয়ে দেব আমি।

আচ্ছা।

খানিকক্ষণ বসিয়া, তামাক খাইয়া এবং বিবাহ বিষয়ে গল্পসল্প করিয়া বিভাবতীর দাদা চলিয়া গেল। থাকিতে পারিল না, কারণ নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে তাহাকে আরও কয়েক স্থানে যাইতে হইবে।

বিভাবতী বলিল, আমি যাব না। গেলেই মা বালার কথা জিজ্ঞেস করবেন।

গণেশ চুপ করিয়া রহিল।

যথাসময়ে বিবাহের দিন আসিল। অসুখের ছুতা করিয়া বিভাবতী গেল না।

মাসখানেক পরে হঠাৎ বিভাবতী একদিন রাত্রে বলিল, একটা জিনিস দেখবে ?

কি ?

বিভাবতী এক জোড়া বালা বাহির করিয়া দেখাইল—এক জোড়া শিমুলকাঁটা বালা।

কোথা পেলে তুমি ?

যেখানেই পাই না, কেমন, দেখতে ভাল নয় ?

চমৎকার ! মিত্তিরদের বুঝি ?

হ্যাঁ, তোমাকে দেখাতে এনেছি। আমাদের দুজনের হাতের মাপও এক, এই দেখ, আশ্চর্য্য কিন্তু। বিভাবতী বালা দুইটি হাতে পরিয়া হাত ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখাইতে লাগিল, বিস্ফারিতচক্ষু গণেশ দেখিতে লাগিল।

কাঁটাগুলো বড্ড ধার, নয় ?

চমৎকার !

তাহার পরদিন গণেশ দোকানে কাজ করিতেছিল, এমন সময় বিধু স্যাকরা আসিয়া উপস্থিত। দিগম্বর আঢ্যের পুত্রবধূর জন্য একজোড়া শিমুলকাঁটা বালা গড়িতে হইবে, তাহারই বায়না লইতে আসিয়াছে। দিগম্বর আঢ্যির পুত্রবধূর গহনার অভাব নাই, দুই সেট গহনা তো বিবাহের সময় দিগম্বর আঢ্যিই দিয়াছেন। এই বিধুই গড়িয়াছে এবং গণেশ টাকা গনিয়া দিয়াছে।

দিগম্বর গদিতেই ছিলেন, বিধু স্যাকরাকে দেখিবামাত্র চশমা খুলিয়া মুছিয়া এবং পুনরায় পরিধান করিয়া বলিলেন, বিধু এসেছ, শোন, বউমা ঝোঁক ধরেছেন, নতুন ফেসিয়ানের কি বালা বেরিয়েছ আজকাল, শিমুলকাঁটা না কি, তাই একজোড়া গড়িয়ে দিতে হবে। দিতেই যখন হবে, তখন ভাল ক'রে দেখে শুনে নাও সব। দেখো, আবার যেন প্যাটার্নের গোলমাল না হয়ে যায়। যাও, ভেতরে যাও তুমি, আমি ঠিক বোঝাতে পারব না।

বিধু ভিতরে চলিয়া গেল।

আরও কিছুদিন কাটিল।

সন্ধ্যা তখনও উত্তীর্ণ হয় নাই। বিভাবতী রান্নাঘরে পোস্ত বাটিতেছিল, হঠাৎ গণেশ আসিয়া উপস্থিত। রগের শিরাগুলি খুব ফুলিয়া উঠিয়াছে, চক্ষু দুইটি ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। বিভাবতী বিস্মিত হইল।

এ কি! আজ এত সকাল সকাল যে?

শোন।

কি?

বালা গড়িয়ে আনলুম। দেখ তো।

গণেশের গলার স্বর কাঁপিয়া গেল। বিস্মিত বিভাবতী দেখিল, সত্য সত্যই একজোড়া শিমুলকাঁটা বালা বেগুনী রঙের কাগজে মোড়া রহিয়াছে।

আমাকে বল নি তো কিচ্ছু! টাকা কোথায় পেলে?

পেলাম যেমন ক'রে হোক। প'রে দেখ তুমি।

হাতটা ধুয়ে আসি।

না, আগে পর।

জোর করিয়া পরাইয়া দিল। বাঃ, চমৎকার মানাইয়াছে! গণেশের সমস্ত মুখ হাসিতে ভরিয়া উঠিল। পকেট হইতে একটি শিশি বাহির করিল।

ওটা কি?

ল্যাভেণ্ডার।

ল্যাভেণ্ডার কি হবে?

ছেটাব চারদিকে, চল না।

বিস্মিত বিভাবতীকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া গণেশ ঘরে ঢুকিল।

বকুলগাছের ফাঁক দিয়া জ্যোৎস্নার ফালি বিছানায় আসিয়া পড়িয়াছে। বকুলফুল ও ল্যাভেণ্ডারের উগ্র গন্ধে সমস্ত ঘর আমোদিত। গণেশ ও বিভাবতী পাশাপাশি শুইয়া ঘুমাইতেছে। বিভাবতীর হাতে শিমুলকাঁটা বালা পরা।

উঃ! উঃ!

গণেশ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

বিভাবতীরও ঘুম ভাঙিয়া গেল।

কি হ'ল?

রগের কাছে লাগল খুব, তোমার বালার কাঁটায় বোধ হয়। এ কি, রক্ত পড়ছে যে! উঃ, খুব রক্ত পড়ছে, আলোটা জাল তো।

বিভাবতী তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিল। দেখিল, ফিনিক দিয়া রক্ত বাহির হইতেছে। বালার কাঁটায় রগের স্ফীত শিরা একটা কাটিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি ন্যাকড়া ছিঁড়িয়া বাঁধিয়া দিল, ন্যাকড়া দেখিতে দেখিতে ভিজিয়া গেল। উঠান হইতে দূর্ব্বাঘাস আনিয়া চিবাইয়া ক্ষতস্থানে লাগাইল, ন্যাকড়ায় রেড়ির তেল ভিজাইয়া পুরু করিয়া পটি দিল, আঙুল দিয়া টিপিয়া ধরিয়া রাখিল খানিকক্ষণ,

খয়ের গুলিয়া দিল,—কোন ফল হইল না। রক্ত সমানে পড়িতে লাগিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে দিগম্বর আঢ্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে বিধু স্যাকরা এবং লাল-পাগড়ি পুলিস। গণেশের মাথাতেও একটা লাল পাগড়ি ছিল, কিন্তু অত টকটকে লাল নয়, একটু কালচে-গোছের লাল। শিয়রে বসিয়া বিভাবতী হাওয়া করিতেছিল।

বিধু বলিল, এই যে, এই বালা—আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এল আপনার নাম ক'রে। আমিও দিয়ে দিলাম, এতদিনের পুরনো চাকর আপনার, ভাবতেই পারি নি।

চোরাই মাল পাওয়া গেল, চোরকে কিন্তু ধরা গেল না। কয়েক মিনিট পূর্ব্বেই গণেশ মারা গিয়াছিল। বিভাবতী বুঝিতে পারে নাই, সে মৃত স্বামীকেই বসিয়া হাওয়া করিতেছিল।

দোলের দিনে

সত্যই তো, দোলের দিন। অখিলবাবুরা যে পাড়ায় বাস করেন, সে পাড়ায় সুজাতা দেবীর স্বস্তি না পাবারই কথা। আশেপাশে যত কুলি মজুর মুটে মিস্ত্রী মারোয়াড়ী। ছোটলোকের পাড়া। অখিলবাবুরা এসে পর্য্যন্ত খুঁতখুঁত করছেন সবাই। অখিলবাবুর দুই মেয়ে অণিমা তনিমা তো বটেই, ছোট খোকা ওস্তাদ পর্য্যন্ত। সুজাতা দেবীর তো কথাই নেই। তিনি বিলেত-ফেরত ঘরের মেয়ে। ফির্‌পো, লেড্‌ল, হ্যামিল্টন, আর্মি নেভির আবহাওয়ায় মানুষ। অখিলবাবুর হাতে প'ড়ে তাঁর অধঃপতনই হয়েছে—এ কথা তিনি এবং তাঁর স্বজনবর্গ সবাই জানেন, বলেনও। কিন্তু নিয়তির ওপর তো আর কথা চলে না। অখিলবাবু সাব-ডেপুটি। সম্প্রতি এই শহরে বদলি হয়ে এসেছেন। জিতেনবাবুর ওপর বাড়ি ভাড়া করবার ভার ছিল। জিতেনবাবু অখিলবাবুর অধস্তন কর্ম্মচারী। তিনি আলো হাওয়া সস্তা এই সব দেখে, বাড়িটা পছন্দ করেছিলেন, পাড়াটাও খুব খারাপ ব'লে তাঁর মনে হয় নি। কিন্তু তাঁর মন আর সুজাতার মন আকাশ-পাতাল তফাত যে! সে কথা সুজাতা মুখ ফুটে ব'লেও দিয়েছেন তাঁকে একদিন। জিতেনবাবু ভদ্রতর পাড়ায় একটা বাড়ি খুঁজে বার করবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছেন। চাকরি বজায় রাখতে গেলে এসব করতেই হবে। উপায় কি!

কোনক্রমে তবু চলছিল, দোল এসে পড়াতে ব্যাপারটা কিন্তু জটিলতর হয়ে উঠল। অণিমা-তনিমার বয়স হয়েছে, তাদের নিয়েই আরও বেশি মুশকিল হ'ল। পাড়ায় যত সব অসভ্য লোকদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে কাঁহাতক চলতে পারে মানুষ! দোলের হিড়িকে আরও বেয়াদব হয়ে উঠেছে যেন

সবাই। শুক্লপক্ষ যেদিন থেকে পড়েছে, সেই দিন থেকেই শুরু হয়েছে। বাড়ির পাশে খানিকটা মাঠ আছে। সন্ধ্যের পর সেখানে এসে লোকগুলো গান-বাজনার নামে যে হল্লা হৈ-হৈটা করছে এ কদিন, তা বলবার নয়। গান-বাজনারই বা কি বাহার—খচখচ খচখচ, আর তার সঙ্গে বেসুরো চীৎকার তাড়ির ভাঁড় সামনে রেখে। এ কদিন এতটুকু স্বস্তি ছিল না বাড়িতে। অণিমা সন্ধ্যের পর সেতার বাজায়, তনিমা স্বরলিপি দেখে গান শেখে, কিন্তু কানের কাছে এই তাণ্ডব হ'তে থাকলে কি আর কিছু করা যায়! ওস্তাদের পড়াও শিকেয় উঠেছে। পাড়ার যত অসভ্য ছেলেদের সঙ্গে মিশে এরই মধ্যে দুটো-একটা খারাপ কথা শিখেছেন ছেলে। এ পাড়ায় থাকলে জংলী বুনো হয়ে যাবে ও। অখিলবাবু সকালে খেয়ে কোর্টে বেরিয়ে যান, ফেরেন পাঁচটায়। জলখাবার খেয়েই আবার ক্লাবে যান, ফেরেন রাত দশটায়। যত ঝঞ্ঝাট সুজাতাকেই পোয়াতে হয়। এ রকম অসভ্য পাড়ায় সুজাতা আর কখনও থাকেন নি। জানলা খুলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধবার জো নেই—হাঁ ক'রে চেয়ে দেখবে। আবার এখানে এসে কপালগুণে যে চাকর বামুন আর দাই জুটেছে, তারা এমন আনাড়ী যে, তাদের পেছনে ঘুরতে ঘুরতেও সুজাতার প্রাণ অস্ত হবার যোগাড় হয়েছে। বোনপোর জন্যে যে শোয়েটারটা বুনতে শুরু করেছিলেন এবার শীতে, সেটা শেষই করতে পারলেন না।

ছ্যা-র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা—

ওই আসছে। এখনই এক দল গেল, আবার আসছে আর এক দল। উঃ, কাল থেকে কি কাণ্ডই যে হচ্ছে! কাল "ধুর-খেল" ছিল। সে কি কাণ্ড! ছেলে বুড়ো সবাই আপাদমস্তক ধুলো-কাদা মেখে ভূতের মতন ঘুরে বেরিয়েছে রাস্তায় দল বেঁধে। সামনে কাউকে পেলেই হ'ল, অমনই সমস্বরে চীৎকার ক'রে তাকে ঘিরে ধরেছে, আর তার গায়ে মুখে মাথায়

ধুলো-কাদা মাখিয়ে তাকেও ভূত বানিয়ে নাস্তানাবুদ ক'রে তবে ছেড়েছে। নর্দ্দমা থেকে পাঁক তুলে ছোঁড়াছুঁড়ি করতেও বাধছিল না লোকগুলোর। হি হি ক'রে হাসতে হাসতে দু হাত তুলে নাচছিল আবার। মানুষ, না ভূত-প্রেত! ছি ছি ছি ছি!

ছ্যা-রা-রা-রা-রা—

অণিমা, স'রে আয় ওখান থেকে।

কিন্তু ওরা বোধ হয় অণিমাকে দেখতে পেয়ে গেল। হৈ-হৈ ক'রে উঠল সমস্বরে। গলির দিকে জানলাটা খোলা ছিল। সুজাতা এগিয়ে গিয়ে দেখলেন,-এক দল ফাগ-মাখা ছোঁড়া ঢোল আর খঞ্জনি বাজিয়ে মহানন্দে নৃত্য করছে। দড়াম ক'রে জানলাটা বন্ধ ক'রে দিলেন তিনি।

ছ্যা-রা-রা-রা-রা—

মুখে মুখে তৈরি ক'রে একটা অশ্লীল ছড়া তারস্বরে গেয়ে দিলে একজন। অণিমার মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল। বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে। সুজাতা গুম হয়ে ব'সে রইলেন। লোকগুলো যাবার নাম করে না। সুজাতার চোখের দৃষ্টিতে আগুন ছুটতে লাগল। উনিও আজ সকাল থেকেই বেরিয়েছেন। এমন এক লক্ষ্মীছাড়া এস. ডি. ও. জুটেছে যে, ছুটির দিনেও রেহাই দেবে না। খানিকক্ষণ ব'সে থেকে সুজাতা হঠাৎ ছাতে উঠে গেলেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে। নীচে ব'সে থাকা নিরাপদ মনে হ'ল না। কিন্তু ছাতেও বিপদ ছিল। যেতে না যেতেই কোথা থেকে এক পিচকিরি রঙ এসে লাগল তাঁর শাড়িতে। কে দিলে দেখতে পেলেন না। আশেপাশে সব ছাত, আলসের পাশে কে কোথা লুকিয়ে আছে দেখা যায় না। রাগে বিরক্তিতে সমস্ত মনটা ভ'রে উঠল তার। এতবড় স্পর্দ্ধা! নীচে নেমে এলেন দুমদুম ক'রে।

রামশরণ!—ক্রুদ্ধকণ্ঠে চাকরকে ডাকলেন। সাড়া পাওয়া গেল না।

দুবেজি !

ঠাকুরেরও সাড়া নেই। খিড়কি খুলে দুজনেই বেরিয়ে গেছে। অল্পবয়সী দাইটা উঠনে বাসন মাজছিল। সে আজ ছুটি চেয়েছিল, কিন্তু সুজাতা ছুটি দেন নি। তার হলদে রঙে ছোপানো আডময়লা শাড়িতেও এক পিচকিরি রঙ কে যেন দিয়েছে। বাঁদর সব ! বুনো ! জংলী !

উলোগকো বোলাও, আর কেবাড়ি লাগা দেও।

সুজাতার ভয় হতে লাগল, ওই ভিড়টা যদি উঠনে ঢুকে পড়ে, তা হ'লেই তো সর্ব্বনাশ ! তাড়াতাড়ি মেয়েদের নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লেন তিনি।

খিড়কি-দরজা দিয়ে দাই মুখ বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত ক'রে হর্ষধ্বনি উঠল।

ছ্যা-রা-রা-রা-রা—

সুজাতা বাথ-রুমে ঢুকে রঙ-দেওয়া কাপড়টা ছেড়ে তখনই রঙটা ভাল ক'রে ধুয়ে ফেললেন। ভিজিয়ে দিলেন কাপড়টা।

ক্রমশ বাইরের হাল্লাটা ক'মে গেল, মনে হ'ল, তারা চ'লে যাচ্ছে। খিড়কি বন্ধ করার শব্দও পাওয়া গেল। সুজাতা বাথ-রুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন, দাইটাকে লাল রঙে চুবিয়ে দিয়েছে ব্যাটারা একেবারে, ভিজে কাপড় গায়ে সেঁটে গেছে। বেহায়া মেয়েটা মুচকে মুচকে হাসছে তবু। রামশরণ এবং দুবেজিরও আপাদমস্তক রঞ্জিত এবং তারাও আনন্দে গদগদ।

কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল।

উনি এলেন বোধ হয় !

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সুজাতা তাড়াতাড়ি কপাটটা খুলেই ভয়ে বিস্ময়ে হকচকিয়ে গেলেন।

জিতেনবাবুর এ কি অদ্ভুত চেহারা! ভদ্রলোকের মাথায় মুখে কামিজে কাপড়ে লাল নীল সবুজ হলুদ বেগুনী—কোনও রঙ আর বাকি নেই।

এ কি কাণ্ড!

অপ্রস্তুত মুখে জিতেনবাবু বললেন, একটা ভাল বাড়ির খবর পেয়েছি, তাই ভাবলাম, খবরটা ব'লে যাই।

কোথায়?

জিতেনবাবু যে পাড়ার নাম করলেন, সেটা এখানকার নামজাদা পাড়া। সাহেব-সুবো অফিসারদের পাড়া। সুজাতা অকূলে কূল পেলেন যেন।

কবে খালি হবে?

কাল খালি হয়েছে।

ও, যে বাড়িতে ডি. এস. পি. ছিলেন?

হ্যাঁ, সেইটেই।

সে তো চমৎকার বাড়ি। এখনই যাওয়া যায়?

এখনই?

এখনই যাব তা হ'লে। এখানে চতুর্দ্দিকে যা কাণ্ড ঘটছে!

কেন, কি হ'ল?

কপাট বন্ধ ক'রে ব'সে আছি সকাল থেকে।

জিতেনবাবু সুজাতা দেবীর শুভ্র কাপড়খানার দিকে চেয়ে দেখলেন। সুতির হ'লেও দামী কাপড়। রঙ লেগে নষ্ট হয়ে গেলে সত্যিই কষ্টের কারণ ঘটবে।

আচ্ছা, দেখি তা হ'লে।

জিতেনবাবু চ'লে গেলেন।

সুজাতা দেবী প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করলেন। একটু

পরে এক ছ্যাকড়া-গাড়িতে চেপে অখিলবাবু এলেন। গাড়োয়ান লালে লাল, ঘোড়া দুটোর গায়েও রঙ। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয়, অখিলবাবুও নিস্তার পান নাই।

রাস্তায় দিলে বুঝি কেউ?

না, রাস্তায় দেয় নি। দিলেন স্বয়ং এস. ডি. ও.। ভদ্রলোক সেকেলে গোঁড়া লোক, কি আর করি বল?

সোফাটায় ব'সো না যেন ধপ ক'রে। কাপড়-চোপড় ছাড় আগে। ছি ছি, পাঞ্জাবিটা নষ্ট ক'রে দিয়েছে একেবারে, এমন দামী সিল্কটা—

দুই

সন্ধ্যা আসন্ন।

উন্মত্ত জনতা আনন্দে অধীর হয়ে এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তায় রাস্তায়। তাদের আনন্দ-কলরব এখনও থামে নি। আম্রমুকুলের গন্ধে আকাশ-বাতাস মদির হয়ে উঠেছে, অশোক পলাশ কিংশুকের পল্লবে পল্লবে জীবনবহ্নি লক্ষ লক্ষ অগ্নিশিখায় মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে যেন, স্বর্ণকান্তি কর্ণিকার পুষ্পভারে শাখা-প্রশাখা অবনত, শুভ্র কুন্দকুসুমগুচ্ছ ঠিক তেমনই ভাবে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে প্রিয়াদন্তপংক্তিশোভা, কালিদাসের কালে যেমন দিত। কোকিল ডাকছে, ভ্রমরগুঞ্জনমুখরিত হয়ে উঠেছে কানন-কান্তার, প্রাকৃত জনতা সমস্ত লজ্জা সমস্ত ভব্যতা বিসর্জ্জন দিয়ে রঙে-রসে আনন্দে-নেশায় বিভোর হয়ে উন্মত্তের মত পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখনও।

ছ্যাকড়া-গাড়ির দরজা-জানলা এঁটে বন্ধ ক'রে সুজাতা দেবী চলেছেন সভ্য পাড়ায়।

নাম

আমাদের পাড়ায় নবাগত যতীনবাবু লোকটিকে এক হিসাবে অভদ্রই বলা চলে। সমাজের সাধারণ আইনকানুন মেনে কিছুতেই চলবেন না ভদ্রলোক। কোথাও নিমন্ত্রণ করলে যান না, পাড়ার কারও খবর নেন না, বাড়িতে কেউ গেলে আপ্যায়িত হবার ভাব দেখেন না, বরং ভাব-ভঙ্গীতে প্রকাশ করেন, যেন একটু বিরক্তই হয়েছেন। তবু আমরা প্রায় প্রত্যহ বৈকালে তাঁর বাড়িতে যাই এসব সত্ত্বেও এবং নিয়মিতভাবে চা পান ক'রে থাকি। যতীনবাবুর চরিত্রে যতই খুঁত থাক্, তাঁর বাড়ির চা-টি একেবারে নিঁখুত। সেদিন বিকেলে আমরা যখন গেলাম— আমরা মানে, আমি, মাধববাবু আর পুণ্ডরীকাক্ষবাবু—তখন তিনি আর একজন কার সঙ্গে যেন গল্প করছিলেন। ভদ্রলোককে ইতিপূর্ব্বে কোথাও দেখেছি ব'লে মনে হ'ল না। যতীনবাবুর যা স্বভাব, আমাদের দিকে এক নজর চেয়ে দেখলেন মাত্র, কিন্তু মুখের ফাঁকে যে একবার 'আসুন' বা 'বসুন' বলা, তা একবারও বললেন না, গল্পই ক'রে যেতে লাগলেন। তবু আমরা বসলাম।

যতীনবাবু বলছিলেন, ছেলেবেলা থেকেই ওই রকম। পাণ্ডাগিরি ক'রে বেড়াত ইস্কুলে, আর সেই সময়েই মদ খেতে শেখে বোধ হয়।

পুণ্ডরীকাক্ষবাবু আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না।

আমাদের হেমবাবুর ছেলে ফট্‌কের কথা বলছ বুঝি ?

যতীনবাবু এ কথার কোন জবাব দিলেন না, একটু হেসে সেই লোকটির দিকে চেয়ে ব'লে যেতে লাগলেন, তারপর তার বাপ তাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিলে, অবশ্য ঠিক যে কেন ছাড়িয়ে নিলে তা বলা

শক্ত, কিন্তু ছাড়িয়ে নিলে, ছাড়িয়ে পাঠিয়ে দিলে বেহারের এক শহরে তাঁর এক আত্মীয়ের কাছে। হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলেছি, ইতিমধ্যে ছোকরা কবিতা লিখতে শুরু করেছিল।

মাধববাবু পুণ্ডরীকাক্ষবাবুর দিকে চেয়ে ঈষৎ নিম্নকণ্ঠে বললেন, আমাদের জগার কথা বলছেন, বুঝছ না? বার দুই আই. এ. ফেল ক'রে আমাদের তপোনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র জগদীশ পরের পয়সায় মদ এবং সিনেমার কাগজে প্রেমের পদ্য লিখতে শুরু করেছিল, সম্প্রতি সে ছাপরায় গেছে মামার বাড়িতে। সুতরাং মাধববাবুর অনুমান খুব অসঙ্গত নয়। যতীনবাবু কিন্তু সমর্থন বা প্রতিবাদ কিছুই করলেন না।

ব'লে যেতে লাগলেন—

বেহারে গিয়ে তার কাব্যরোগ হু-হু ক'রে বেড়ে গেল। বেহারে তার বাপ তাকে পাঠিয়েছিল আত্মীয়ের কাছে থেকে সেই আত্মীয়েরই কারবারে ওয়াকিবহাল হবার জন্যে। ছোকরা কারবারের ধার দিয়েও গেল না, লম্বা লম্বা কবিতা লিখে মাসিকে আর সাপ্তাহিকে পাঠাতে লাগল আর বাকি সময়টা ঘরের কোণে ব'সে কাটাতে লাগল যত সব বাজে বই প'ড়ে।

অপরিচিত ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, বাজে বই মানে, কি বই?

দর্শন, কাব্য, সাহিত্য—এই সব আর কি, অর্থাৎ ইন্‌ডিগো সম্বন্ধে কোন বই নয়।

ইন্‌ডিগো সম্বন্ধে বই মানে?

অর্থাৎ যে বই পড়লে ব্যবসার উপকার হ'ত। সেই আত্মীয় ভদ্রলোকের নীলের কারবার ছিল।

তারপর?

তারপর আর কি, উত্যক্ত হয়ে উঠলেন আত্মীয়টি ক্রমশ—

চা এসে পড়ল। পুণ্ডরীকাক্ষ আপিঙের কৌটো বার করলেন। ইন্‌ডিগো শুনেই আমরা বুঝেছিলাম, এ জগো নয়, আর কেউ। মাধব ভাবছিলেন, কে হতে পারে?

যতীনবাবু বললেন, তারপর হ'ল এক কাণ্ড। কলকাতার এক সম্পাদক ডেকে পাঠালে ছোকরাকে, বললে, তোমার প্রতিভায় আমি মুগ্ধ, তুমি এসে আমার কাগজের সহকারী সম্পাদক হও আর তোমার কবিতাগুলো ছাপিয়ে ফেল। ছুটল ছোকরা কলকাতায় আর জুটল গিয়ে সাহিত্যিক-মহলে। অহিফেনের বটিকাটি গলাধঃকরণ ক'রে পুণ্ডরীকাক্ষ বললেন, আমাদের ক্ষীরোদচন্দ্র আর কি! ক্ষীরোদের সঙ্গে এই ছোকরার একটু মিল ছিল অবশ্য, ক্ষীরোদও একটা কাগজের সহকারী সম্পাদক হয়েছিল কিছুদিন।

যতীনবাবু বলতে লাগলেন, ছোকরা কিন্তু জমিয়ে ফেললে কলকাতায়—

যদিও যতীনবাবু পুণ্ডরীকাক্ষের দিকে ফিরেও চান নি, তবু পুণ্ডরীকাক্ষ বললেন, তাই নাকি?

খুব জমিয়ে ফেললে, সাহিত্যিক-মহলে নাম তো হ'লই, অসাহিত্যিকরাও বলাবলি করতে লাগল তার বিষয়ে, ফলে একটা চাকরি জুটে গেল।

অপরিচিত ভদ্রলোক বললেন, কি চাকরি?

ইস্কুল-মাস্টারি।

তারপর?

দিন কতক খুব নামডাকও হ'ল—খুব ভাল মাস্টার, খুব ভাল মাস্টার; কিন্তু অতিরিক্ত রকম বাহাদুরি করতে গিয়েই ম'ল ছোকরা—

কি রকম?

ছাত্রদের সঙ্গে খুব বেশি রকম মাখামাখি শুরু ক'রে দিলে, ছাত্ররা হয়ে উঠল তার ইয়ার—

মাধববাবু চা-পানান্তে ময়লা রুমাল দিয়ে ঝোলা গোঁফ-জোড়া মুছছিলেন, তিনি এই কথায় একটু টিপ্পনী করলেন, আজকাল ছেলেদের ধরন-ধারণই ওই রকম। বুঝতে পেরেছি, আমাদের আশু মাস্টারের কথা বলছেন আপনি, ওর হিস্ট্রি জানেন নাকি?

যতীনবাবু একটু হাসলেন মাত্র, কোন জবাব দিলেন না। আমাদের এখানকার স্কুলের নবাগত শিক্ষকটির বদনাম রটেছিল, তিনি ছেলেদের সঙ্গে বড্ড বেশি মেশেন নাকি।

অপরিচিত ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, তারপর?

তারপর আর কি, চাকরিটি গেল। নানা রকম বদনাম রটতে লাগল, গার্জেনরা ভয় পেলেন, ছেলেদের মতিগতি বিগড়ে যাবে, কমিটি তাড়িয়ে দিলে—মানে দিতে বাধ্য হ'ল।

ছেলেদের মতিগতি বিগড়ে যাবে। কেন?

ও ছেলেদের সঙ্গে মদ খেত, বলত ধর্ম্মটর্ম্ম সেকেলে বন-মানুষের কাণ্ডকারখানা, এ যুগে ওসব অচল। বলত, কুসংস্কার তুলে দাও—ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের গল্প করত, বেন্থাম মিল আওড়াত।

তারপর?

এ দেশে আর কত 'তারপর' থাকবে, দিন কতক ভ্যারেণ্ডা ভেজে ভেজে ঘুরে বেড়ালে, বুড়োদের উপদেশ আর গালাগালি শুনলে, তারপর পট ক'রে একদিন ম'রে গেল।

ম'রে গেল! কেন, কি হ'ল?

কলেরা।

মাধববাবু বললেন, বুঝেছি, নিপুর ভাগ্নের কথা বলছেন, সেও

কলকাতায় মাস্টারি করছিল, একটু বখাটে-গোছেরই ছিল, বছরখানেক হ'ল মারা গেছে। নিপুর ভাগ্নের কথাই বলছেন, নয়?

পুণ্ডরীকাক্ষ প্রতিবাদ করলেন, নিপুর ভাগ্নে মদ খেত না। মদ খেত আমাদের ছিরে, মাস্টারিও করত, কিন্তু সে মারা গেছে টাইফয়েডে, আপনি বোধ হয় ভুল খবর শুনেছেন যতীনবাবু।

যতীনবাবু আবার একটু হাসলেন, জবাব দিলেন না। এমন অভদ্র লোক কদাচিৎ চোখে পড়ে।

অপরিচিত লোকটির দিকে চেয়ে যতীনবাবু বললেন, শ্রদ্ধা হয় লোকটার ওপর?

অপরিচিত ভদ্রলোক বললেন, এই আপনার গ্রেট ম্যানের গল্প?

নামটা চেপে রেখেছি ব'লে গ্রেট ব'লে মনে হচ্ছে না, নামটা আগে বললে প্রতি পদে গ্রেট্‌নেস দেখতে পেতে! I hate you, I hate you all.

নামটা কি, শুনিই না?

হেন্‌রি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও।

তিলোত্তমা

এক

সকলেরই জীবনে মাঝে মাঝে এমন একটি নাটকীয় মুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হয় যে, সমস্ত হিসাব, সমস্ত আয়োজন হঠাৎ নিমেষে বদলাইয়া যায়। উত্তরবাহিনী নদীস্রোত সহসা দক্ষিণবাহিনী হইয়া পড়ে, তুঙ্গ পর্ব্বত অকস্মাৎ গভীর গহ্বরে পরিণত হয়। সাধারণ মানুষের জীবনেই এসব হয়। ইহার জন্য রাম বা রাবণ হইবার প্রয়োজন নাই।

নকুল নন্দী সাধারণ লোক, তাহার পুত্র গোকুলও অসাধারণ কিছু নহে। আর পাঁচজনের মত সেও বিয়ে পাস করিয়া এখানে ওখানে আড্ডা দিয়া, তাস খেলিয়া, শখের থিয়েটারে অভিনয় করিয়া, রাজনীতি অথবা সাহিত্য সম্পর্কে মাথা ঘামাইয়া অর্থাৎ এক কথায় ভ্যারেণ্ডা ভাজিয়া দিন যাপন করিতেছিল। আর পাঁচজনের যেমন বিবাহের সম্বন্ধ আসে, গোকুলেরও তেমনই আসিতে লাগিল। বিবাহের বাজারে গোকুল সুপাত্র। শহরের উপর একখানি ত্রিতল বাড়ি, পিতার তেজারতি-ব্যবসায়, মাতুলালয়ের বিষয়-সম্পত্তি যাহা আছে, তাহাতে কোন কালে গোকুলকে উদরান্নের জন্য চাকুরির উপর নির্ভর করিতে হইবে না। ভগবান তাহাকে যাহা দিয়াছেন, তাহাতে স্বচ্ছন্দে সে সারাজীবন শখের থিয়েটারে রিজিয়ার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া নাট্যশিল্পের উৎকর্ষ বিধান করিতে পারে।

বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। পিতা নকুল নন্দী অভিজ্ঞ লোক। কুষ্টি, বংশ, পাত্রীর রূপ, পণের পরিমাণ সমস্ত দিক বিচার করিয়া নন্দী

মহাশয় যে পাত্রীটিকে মনোনীত করিলেন, তাহার ডাকনাম তিলু, ভাল নাম তিলোত্তমা। নন্দী মহাশয় সেকেলে লোক, সুতরাং পুত্রকে না পাঠাইয়া নিজেই কন্যা দেখিতে গেলেন এবং পছন্দ করিয়া আসিলেন। নাম শুনিয়া গোকুল মুগ্ধ হইয়া গেল। মনে মনে সে যে ছবিটি আঁকিতে লাগিল, কাব্যের তিলোত্তমা তাহার কাছে কিছু নয়।

দুই

শুভদৃষ্টির সময় কিন্তু সে ঘাবড়াইয়া গেল। তিলোত্তমাই বটে! তিলের মতই কুচকুচে কালো এবং গোল। ছোট ছোট চোখে ভীরু শঙ্কিত দৃষ্টি। উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, কোলাহলধ্বনি, পরিবেশনধ্বনি, নানারূপ ধ্বনির মধ্যে ইহারই পাণিপীড়ন তাহাকে করিতে হইল। উপায় নাই। কিন্তু ঘাবড়াইয়া গেল।

পিতা নকুল নন্দীও ঘাবড়াইয়া গেলেন। তিনি বেহাইটিকে যেরূপ সোজা লোক মনে করিয়াছিলেন, দেখিলেন, আসলে তিনি মোটেই সেরূপ সোজা নহেন। লোকটা হাত কচলাইয়া ক্রমাগত হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ করিয়া চলিয়াছে, অথচ একটিও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নাই। নগদ পাঁচ শত টাকা পণ কম দিয়াছে, বলিতেছে, এখন সব জুটাইতে পারা গেল না, বাকি-টাকা পরে পরিশোধ করিয়া দিব। দানপত্র যাহা দিয়াছে, অত্যন্ত খেলো। চেলীর রঙ উঠিয়া যাইতেছে। রিস্টওয়াচ নাই—কলিকাতায় নাকি অর্ডার দেওয়া হইয়াছে, এখনও আসিয়া পৌছায় নাই। আংটিটা সোনার কি না কে জানে—দেখিতে তো পিতলের মত। তিনি শেষে একটা ধড়িবাজের সহিতই কুটুম্বিতা করিয়া বসিলেন নাকি? তখন তিনি যাহা যাহা দাবি করিয়াছিলেন, লোকটা

তাহাতেই রাজি হইয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে ঘাড় নাড়িয়াছিল। দাবি অবশ্য তিনি একটু বেশিই করিয়াছিলেন, কিন্তু বেশি টাকা না পাইলে ওই কুচ্ছিৎ হাঁদামুখো মোটা মেয়েকে পুত্রবধূরূপে বরণ করিয়া লইবেনই বা কেন তিনি? সব জিনিসেরই একটা হিসাব আছে তো! কিন্তু এ কি কাণ্ড? ওই অতি বিনয়ী লোকটার নিকট এ ব্যবহার কে প্রত্যাশা করিয়াছিল? বাড়িতেও যৎপরোনাস্তি গাল খাইতে হইল। গোকুলের মা উচ্চকণ্ঠে এই কথাই বার বার বিঘোষিত করিতে লাগিলেন যে, নকুলের 'ভীমরতি' ধরিয়াছে। তাহা না হইলে কেহ সজ্ঞানে নিজ পুত্রের জন্য ওই পেত্নীকে বউ করিয়া আনিতে পারে? ছি ছি ছি ছি! নকুল মিথ্যা কথা বলিয়া রেহাই পাইলেন—'ও মেয়ে আমাকে দেখায় নি। আমি যে মেয়ে দেখেছিলাম, তার টকটকে রঙ, এক পিঠ চুল, দিব্যি চোখ মুখ, গোল গোল গড়ন। চোর—চোর, জোচ্চোর, ধড়িবাজ ব্যাটা। ছেলের আমি আবার বিয়ে দেব।' সকলেই ইহাতে সায় দিল। এমন কি গোকুল পর্য্যন্ত।

তিন

তিলোত্তমার সহিত আলাপ হইল বইকি। একটা জিনিস গোকুল লক্ষ্য না করিয়া পারিল না, তিলু ভারি ভাল মানুষ। মুক্তকেশী বেগুনের মত তাহার মুখখানিতে ভালমানুষি যেন মাখানো। লাজুকও খুব। অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া তবে তাহার সহিত আলাপ করিতে হইয়াছে। আলাপ করিয়া সে অবাক হইয়া গিয়াছে। তাহার বাবাকে সকলে মিলিয়া যে এত গালাগালি দিল, তাহাতে তাহার ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। সকালে সূর্য্য উঠিলে বা বর্ষাকালে বৃষ্টি নামিলে সে বিস্মিত

বা বিচলিত হয় না। এ ব্যাপারেও হইল না। বিবাহ-ব্যাপারে এসব হইয়াই থাকে, ইহাতে আশ্চর্য্য বা দুঃখিত হইবার কিছু নাই।

নকুল নন্দী তাহার সম্পর্কে যে মিথ্যাভাষণ করিয়াছিলেন, ইচ্ছা করিলে সে তাহার প্রতিবাদ করিতে পারিত। কিন্তু সে করিল না। সসঙ্কোচে চুপ করিয়া রহিল। গোকুলকে স্বামীরূপে পাইযা সে কৃতার্থ হইয়া গিয়াছে, অকারণ বাদ-প্রতিবাদের প্রয়োজন কি? সে প্রতি মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতেছে, সে গোকুলের অনুপযুক্ত, অনধিকারী হইয়াও সে ভাগ্যবলে সুখ-স্বর্গে প্রবেশ করিয়াছে; কলহ-কোলাহল তুলিয়া এ আনন্দলোক হইতে নির্ব্বাসিত হইতে সে চায় না।

গোকুল বলিল, বাবা-মা বলছেন, আবার আমার বিয়ে দেবেন।

তিলু চুপ করিয়া রহিল।

উত্তর দিচ্ছ না যে?

বেশ তো। হিঁদুর ঘরে হয় তো অমন।

তোমার কষ্ট হবে না?

আমার? না।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিল, হ'লেও, তোমার যদি তাতে সুখ হয়, সে কষ্ট সহ্য করব।

গোকুলের মনে হইল, ইহা অভিমানের কথা। কিছু বলিল না।

চার

বছরখানেক কাটিয়া গেল।

তিলুর সম্বন্ধে মোহ-মুক্ত হইবার পক্ষে এক বৎসর যথেষ্ট সময়। না জানে লেখাপড়া, না জানে গান-বাজনা, না জানে হাবভাব। না আছে রূপ, না আছে গুণ। গুণের মধ্যে মহিষের মত খাটিতে পারে। কাঁড়ি

কাঁড়ি বাসন মাজিয়া চলিয়াছে, রাশি রাশি কাপড় কাচিয়া চলিয়াছে। ভ্রূক্ষেপ নাই। মা তাহাকে রান্নাঘরে ঢুকিতে দেন না, সে বাহিরের কাজকর্ম্ম লইয়াই থাকে এবং তাহাতে ডুবিয়া থাকে। আকাশে চাঁদ উঠিল কি না, বকুল-বনে পাপিয়া ডাকিল কি না, এসবের খোঁজ রাখা তাহার সাধ্যাতীত।

নাট্যশিল্পী কবি-প্রকৃতি গোকুল দমিয়া গেল এবং অবশেষে হাল ছাড়িয়া দিল। একটা চাকরানীর সহিত কাঁহাতক আর প্রেম করা যায়!

বাবা যদিও এখনও বেহাই-গুষ্টির উপর চটিয়া আছেন, কিন্তু দ্বিতীয় বার বিবাহের কথা তিনি আর উত্থাপন করেন নাই। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গোকুলের পক্ষেও মুখ ফুটিয়া সে প্রস্তাব করা শক্ত। এমন সময় বিধাতা একদিন মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

পাঁচ

'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনয় হইবে। সেলুকাস ও আন্টিগোনাস অভিনয় করিবার লোক পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু পোশাক পাওয়া যাইতেছে না। গ্রীক পোশাক আনিবার জন্য গোকুল কলিকাতা যাইতেছিল। স্টেশনে টিকিট করিতে গিয়া তাহার চোখে পড়িল, একজন বিধবা প্রৌঢ়া ভিড়ের মধ্যে বড় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। নিজের পুঁটুলি ও কাপড়-চোপড় সামলাইয়া তিনি কিছুতেই টিকিট করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। লোকে চতুর্দ্দিক হইতে ধাক্কাধাক্কি করিয়া তাঁহাকে কেবল পিছাইয়া দিতেছে। গোকুল তাঁহাকে সাহায্য করিল। টিকিট কিনিয়া দিল। তিনিও কলিকাতা যাইতেছেন, তাঁহার সহিত কোনও পুরুষ অভিভাবক নাই, সুতরাং গোকুলকে সে ভারও লইতে হইল। গোকুলের কামরাতেই তিনি উঠিলেন। গোকুল নিজের নানারূপ অসুবিধা করিয়া, এমন কি

একজন প্যাসেঞ্জারের সহিত কলহ করিয়াও তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিল।

প্রৌঢ়া মুগ্ধ হইলেন।

কামরা ক্রমশ খালি হইয়া গেলে প্রৌঢ়া পুঁটুলি হইতে পান বাহির করিয়া গোকুলকে একটি দিলেন, নিজেও একটি লইলেন। তাহার পর চকচকে একটি রূপার কৌটা হইতে খানিকটা জরদাও বাহির করিলেন। গোকুল লইল না, অভ্যাস ছিল না। প্রৌঢ়া স্মিত মুখে নিজের মুখ-বিবরে খানিকটা নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, কপাল যখন পুড়ে গেল, তখন একে একে সবই ছাড়তে হ'ল। এটুকু কিন্তু এখনও ছাড়তে পারি নি বাবা।

মুচকি হাসিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া পিচ ফেলিলেন।

আলাপ শুরু হইয়া গেল।

দীর্ঘ আলাপ হইল। দীর্ঘ আলাপের ফলে প্রৌঢ়া গোকুলের নাড়ীনক্ষত্র সমস্ত জানিয়া লইলেন। গোকুলও মন খুলিয়া সমস্ত বলিয়া ফেলিল। কিছুই গোপন করিল না, করিতে পারিল না, এমন কি করিবার প্রয়োজনও অনুভব করিল না। অর্থাৎ গোকুলও মুগ্ধ। সব শুনিয়া প্রৌঢ়া বলিলেন, তুমি যে আবার বিয়ে করব বলছ, পাত্রী ঠিক হয়েছে কোথাও?

এখনও হয় নি।

আর এক খিলি পান এবং আর একটু জরদা মুখে দিয়া প্রৌঢ়া বলিলেন, দেখ বাবা, তা হ'লে সব কথা তোমাকে খুলেই বলি। আমার একটি মেয়ে আছে, ওই মেয়েটি হবার পরই আমার কপাল পুড়ে গেল। মনের মত একটি পাত্র আমি খুঁজছি। তুমি তো আমাদের পাল্‌টি ঘর, তোমাকে ভারি পছন্দ হয়েছে আমার, আমার মেয়েও কিছু নিন্দের নয়—যদি বল, তা হ'লে—

গোকুল ইহা প্রত্যাশা করে নাই। কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

উষাকে আগে দেখ তুমি। তোমার যদি পছন্দ হয়, তা হ'লে—

আমতা আমতা করিয়া গোকুল বলিল, আমার একটি স্ত্রী বর্ত্তমান আছে, সে কথা জানবার পর আপনার মেয়ে হয়তো আপত্তি করতে পারেন।

আমার কথার ওপর কথা কইবে উষা। তেমন মেয়েই সে নয়। তাকে লেখাপড়া গান-বাজনা সবই শিখিয়েছি, কিন্তু আজকালকার মেয়েদের মত অবাধ্য তাকে হতে দিই নি। আর একটা স্ত্রী থাকলেই বা! তা ছাড়া তুমি যখন আবার বিয়ে করতে যাচ্ছ, তখন সে স্ত্রীকে তুমি ত্যাগই করবে ঠিক করেছ নিশ্চয়—আঁ্যা, কি বল?

তা তো ঠিকই।

তা হ'লে সে স্ত্রী থাকলেই বা কি, আর না থাকলেই বা কি—আঁ্যা, কি বল?

তা তো ঠিকই।

ছয়

উষা উষা নয়—দ্বিপ্রহর।

প্রখর রৌদ্র-কিরণের প্রদীপ্ত স্বর্ণকান্তি তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঝলমল করিতেছে। চোখে-মুখে চলনে-বলনে হাস্যে-কটাক্ষে বিদ্যুৎ। সেতারে অমন গৌড়সারঙের আলাপ গোকুল আর কখনও শোনে নাই, হাসির পরদায় পরদায় এমন গিটকিরি তাহার কল্পনাতীত ছিল।

গোকুল কূল হারাইল।

সাত

ইহার মাসখানেকের মধ্যে প্রায় সব ঠিক হইয়া গেল। উষাকে লইয়া উষার মা চলিয়া আসিলেন এবং গোকুলদের বাড়ির নিকট একটি বাড়ি ভাড়া লইয়া গোকুলের পিতামাতার সহিত কথাবার্ত্তা চালু করিয়া দিলেন। উষাকে দেখিয়া গোকুলের মা শুধু মুগ্ধ নয়—আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। গোকুলের বাবা আত্মহারা হইলেন টাকার অঙ্ক দেখিয়া। ইহার সহিত বিবাহ ঘটাইতে পারিলে নগদ দশ হাজার টাকা, প্রচুর গহনাপত্র এবং ছোটখাটো একটি জমিদারি ঘরে আসিবে। উষার মায়ের নামে একটি কলঙ্ক নাকি আছে—যাহার জন্যই নাকি তাঁহার মেয়ের বিবাহ হইতেছে না। তাহা অবগত হইয়াও নকুল নন্দী বিচলিত হইলেন না। শুধু যে সেটা উপেক্ষা করিলেন তাহা নয়, বাড়ির অপর কাহাকেও জানিতে পর্য্যন্ত দিলেন না, পাছে বিবাহটা ভাঙিয়া যায়। যৌবনকালে অমন পদস্খলন দুই-একবার সকলেরই হয়। উহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই—ইহাই তাঁহার যুক্তি। উষা একটি শর্ত্ত করিল এবং সে শর্ত্তেও গোকুল, গোকুলের মা, বাবা সকলে রাজি হইলেন। বিবাহের পরই তিলোত্তমাকে জন্মের মত বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দিতে হইবে।

আট

রাত্রি দ্বিপ্রহর।

বিনিদ্র নয়নে গোকুল একা বিছানায় জাগিয়া আছে—কাল সকালেই উষার মা তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। কই, তিলোত্তমা তো এখনও আসিল না! এত কাণ্ড হইয়া গেল, তিলোত্তমা একটি কথাও বলে

নাই। তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। গোকুল এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল। সমস্ত কাজ সারিয়া তিলোত্তমা অনেক রাত্রে শুইতে আসে, খুব ভোরে আবার উঠিয়া যায়। তাহার দেখা পাওয়াই শক্ত। গত কুড়ি-পঁচিশ দিনের মধ্যে একবারও তাহার সহিত নির্জ্জনে দেখা হয় নাই, এ সম্বন্ধে কোন আলোচনাই হয় নাই। একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত বইকি। গোকুল প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

হঠাৎ গোকুলের ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেখিল, তিলোত্তমা সসঙ্কোচে উঠিয়া যাইতেছে। ভোর হইয়া গিয়াছে।

শোন, শোন।

কি ?

আজ আশীর্ব্বাদ, মনে আছে তো ?

আছে।

দেখ, তোমার আপত্তি নেই তো ?

না।

বিয়ের পরই তোমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে বলছে—শুনেছ সে কথা ?

শুনেছি। তাই যাব। তুমি এক-আধবার যাও যদি দয়া ক'রে, তাতেই আমাব যথেষ্ট হবে। আমি যাই, আমার অনেক কাজ প'ড়ে আছে।

চলিয়া গেল।

গোকুল কিছুক্ষণ শুম হইয়া শুইয়া রহিল। তাহার পর উঠিয়া বসিল। তাহার পর বিছানা হইতে নামিয়া জানালার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, তিলোত্তমা ছাই-গাদায় বসিয়া বাসন মাজিতেছে।

নয়

আশীর্ব্বাদের সাজ-সরঞ্জাম লইয়া উষার মা আসিলেন। প্রচুর সাজ-সরঞ্জাম। প্রকাণ্ড একটা ফুলের মালাও সঙ্গে আনিয়াছিলেন। মুচকি হাসিয়া বলিলেন, উষা সারারাত ধরিয়া নিজের হাতে মালাটি গাঁথিয়াছে।

গোকুল স্নান করিয়া আসিল। কার্পেটের আসন পাতা হইল। মালা পরিয়া গোকুল আসনে বসিতে যাইবে, এমন সময় গোকুলের মা বলিলেন, শাঁখটা বাজায় কে, আমার ঠোঁটের ঠিক মাঝখানে একটা ব্রণ হয়েছে আবার। ও বউমা, কোথা গেলে তুমি? শাঁখটা বাজাও।

শাঁখটা হাতে লইয়া সসঙ্কোচে তিলোত্তমা দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল।

শাঁখটা বাজিয়া উঠিতেই গোকুলের পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত যেন একটা বিদ্যুৎশিহরণ বহিয়া গেল। আকস্মিক বজ্রাঘাতে সমস্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল যেন।

আমাকে মাপ করবেন।

দুই হাতে মালাটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সে দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেল।

চন্দ্রায়ণ

ট্রেন চলিতেছে।

কামরার মধ্যে চন্দ্রবাবু একা। আপাত-দৃষ্টিতে দ্বিতীয় লোক না থাকিলেও চতুর্দ্দিকে অসংখ্য লোকের মনের কথা স্তূপীকৃত। বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ভঙ্গীতে বিভিন্ন কালিতে বিভিন্ন কাগজে নিবদ্ধ অজস্র লোকের সহস্র প্রকার মনোভাব। নীরব অথচ মুখর। টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে···অন্ধকার গভীর রাত্রি···স্বপ্নলোকে বিচরণ করিবার এই তো উপযুক্ত সময়। স্বপ্নাচ্ছন্ন নয়নে চন্দ্রবাবু এক খিলি পান মুখে ফেলিয়া দিলেন। জরদার কৌটাটি ফতুয়ার পকেট হইতে বাহির করিয়া ঢাকনির উপর বার দুই তর্জ্জনী আঘাত করিয়া তাহা খুলিলেন, বেশ খানিকটা জরদা তুলিয়া উদ্ধমুখে ধীরে ধীরে তাহা ব্যায়ত আননে নিক্ষেপ করিলেন। জানালা খুলিয়া পিক ফেলিলেন। জানালাটি সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করিয়া দিতে হইল—বেশ জোরে একটা হাওয়া উঠিয়াছে। স্বপ্নাবিষ্ট চন্দ্রবাবু ধীরে ধীরে আসিয়া স্বস্থানে উপবেশন করিলেন। চন্দ্রবাবু ধীরপ্রকৃতির মানুষ। তড়বড় করিয়া এটা উল্টাইয়া ওটা ভাঙিয়া ছটফট করিয়া বেড়ানো তাঁহার স্বভাব নয়। যাহা করেন, ধীরে-সুস্থে করেন। পাঁচখানি চিঠি বাছিয়াই রাখিয়াছিলেন। সব চিঠি পড়িবার সময় নাই···চাকুরি করিতে হইবে তো। সময় থাকিলে চন্দ্রবাবু সব না হোক, আরও অনেক চিঠি নিশ্চয়ই পড়িতেন। এসব বিষয়ে তাঁহার কৌতূহলী মন কখনও ক্লান্তি বোধ করে না। খামের চিঠি খুলিবার বিবিধ কৌশল তিনি আয়ত্ত করিয়াছেন। ইহার জন্য যেসব জিনিসের প্রয়োজন, তাহা তাঁহার সঙ্গেই থাকে।

খামগুলি চন্দ্রবাবু একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন। তাহার পর নিবিষ্ট চিত্তে শুরু করিলেন।

দুই

চন্দ্রবাবু যুবক নন, স্থবির বৃদ্ধও নন। বস্তুত, বাহির হইতে দেখিলে তাঁহাকে মনুষ্যরূপী ঝুনা নারিকেল বলিয়া মনে হয়। প্রৌঢ় ব্যক্তি। কিন্তু প্রৌঢ়ত্বের ঠিক কোন্ স্থানে তিনি অবস্থিত বলা কঠিন। চাকুরির খাতা অনুসারে তাঁহার বয়স আটচল্লিশ, কিন্তু তাহা মিথ্যা কথা। কয় বৎসর যে তিনি কমাইয়াছেন তাহা জানাও শক্ত, কারণ সে খবর যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা কেহ বাঁচিয়া নাই। মুখ দেখিয়াও সঠিক কিছু বলা যায় না। দাড়ি-গোঁফ-জুলফিতে পাক ধরিবামাত্রই তিনি ক্ষুর ও কলপের সাহায্য লইয়াছেন। তৃতীয় পক্ষের তরুণী ভার্য্যা মাধুরীর নিকট অপ্রতিভ হইবার লোক তিনি নন। কিন্তু বয়স যাহাই হোক, চন্দ্রবাবু রসিক ব্যক্তি। ঝুনা নারিকেলের অন্তরে শাঁস-জল আছে। তাঁহার ঘোলাটে চোখের দৃষ্টিতে গুলিখোরসুলভ যে প্রাণহীনতা প্রতীয়মান হয়, তাহা স্বপ্নালুতারই ছদ্মবেশ। আকৈশোর রস-পিপাসু তিনি। ছন্দ মিলাইয়া কবিতা অবশ্য কখনও লেখেন নাই, ওসব তুচ্ছ ব্যাপারে কখনও তৃপ্তি হয় না তাঁহার। কবিতা লিখিয়া কি হইবে? কবিতা করা কিংবা কবিতা অনুভব করা—অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জীবনের মধ্যে তাহার রসাস্বাদন করাই তো আসল কথা। তাহা তিনি বহুবার করিয়াছেন। মাসতুতো ভাই তেনা বাঁচিয়া থাকিলে বলিতে পারিত যে, আগ্রহভরে এবং কত কষ্ট সহ্য করিয়া তিনি বাসরঘরে, অথবা নব-দম্পতির শয়ন-কক্ষে কৈশোরকালে আড়ি পাতিতেন। চোরের মত চুপিচুপি উঠিয়া গিয়া

কত বাতায়নতলে যে তিনি কান পাতিয়াছেন, কত ছিদ্রপথে যে চোখ রাখিয়াছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। যৌবনকালেও কবিতা করিয়াছেন অনেক। তাহার ইতিহাস তৎকালীন পরিচিত ডাক্তারেরা এবং তাঁহার বিগত দুই পত্নী জানিতেন। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। ভগবান চাকরিটিও জুটাইয়া দিয়াছেন চমৎকার।

আর. এম. এস.-এর সর্টার তিনি।

বহু কবিতা অনুভব করিবার সুযোগ মিলিয়াছে, মিলিতেছে এবং মিলিবে।

চিঠির ভিতর কত জিনিসই যে দেখিয়াছেন! কত অদ্ভুত রকম মজা! চিঠির কাগজে প্রকাণ্ড ডিগ্রীওয়ালা লোকের নাম ছাপা—মহা বিদ্বান লোক, কিন্তু স্ত্রীকে (অবশ্য, স্ত্রী কি না ভগবানই জানেন!) এমন অশ্লীল ভাষায় চিঠি লিখিয়াছেন যে, তাহা উচ্চারণ করা যায় না। পড়িতে কিন্তু বেশ লাগে।

আগে আগে চন্দ্রবাবু মেয়েলী হাতের লেখা দেখিয়া পত্র খুলিতেন, এখনও দুই-একটা খোলেন; কিন্তু এখন চন্দ্রবাবুর অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে, মেয়েরা তেমন রসাল চিঠি লিখিতে পারে না। প্রায়ই 'আমি ভাল আছি', 'তুমি কেমন আছ' জাতীয় কথায় ভরতি। বড় জোর 'তোমার জন্য মাঝে মাঝে মন কেমন করে, তুমি কবে আসিবে', আর শেষ সেই এক বাঁধি গৎ—'চিঠির উত্তর দিও। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জেনো'— অজস্র বানান ভুল। 'চুমু নাও' মাঝে মাঝে পাইয়াছেন অবশ্য। কিন্তু অধিকাংশই বাজে। কখনও কোন রসবতীর দেখা যে পান নাই, তাহা অবশ্য সত্য নহে; সেই লোভেই এখনও দুই-একটা মেয়েলী হাতের লেখা খোলেন, কিন্তু কদাচিৎ সে রকম রসিকার দেখা পাওয়া যায়। অধিকাংশই বাজে। কি কি জিনিস কিনিয়া আনিতে হইবে, তাহারই

লম্বা ফর্দ্দ সেদিন পাইয়াছিলেন একটা। চিঠি নামমাত্র—সবই ফর্দ্দ। স্বামীকে নয়, যেন বাজার-সরকারকে পত্র লিখিতেছে। মেয়েরা মজাদার চিঠি লিখিতে পারে না—ইহাই চন্দ্রবাবুর অভিজ্ঞতা।

খামের উপর পুরুষ-হস্তে মেয়ের ঠিকানা লেখা দেখিলে চন্দ্রবাবু পুলকিত হইয়া উঠেন। পুরুষদের লেখা চিঠিতেই বস্তু থাকে। এ বিষয়েও অবশ্য চন্দ্রবাবুকে হতাশ হইতে হইয়াছে—বাংলা ইংরেজী ছাড়া অন্য ভাষা তাঁহার জানা নাই। পুরুষের লেখা মেয়েলী নামের চিঠি খুলিয়া হয়তো দেখিলেন, হিন্দী কিংবা অন্য কোন ভাষা। কিংবা হয়তো কোন পিতা কন্যাকে পত্র লিখিতেছেন, কিংবা পুত্র মাতাকে। আর এক জাতীয় বিশেষত্বহীন চিঠিও তিনি মাঝে মাঝে খুলিয়া ফেলেন যাহাতে বোঝাই যায় না যে, লেখকের সহিত উদ্দিষ্টা রমণীটির ঠিক সম্পর্ক কি! কিন্তু এসব কথা বাদ দিলেও মোটের উপর পুরুষদের লেখা চিঠিতেই চন্দ্রবাবু বেশি মজা পাইয়াছেন। ভাল ভাল চিঠির অংশবিশেষ টুকিয়াও রাখিয়াছেন। পুরুষরা নির্লজ্জ—তাহারাই কলম ছুটাইতে জানে। তা ছাড়া তাহারা বেপরোয়া। পুরুষদের লেখা চিঠির ভিতরেই তিনি একবার একশত টাকার নোট একখানা পাইয়াছিলেন। কে যেন লুকাইয়া প্রিয়তমাকে উপহার পাঠাইতেছিল। নোট অবশ্য ওই একবারই পাইয়াছেন, কিন্তু ছবি পাইয়াছেন বহু। তাঁহার একটা অ্যাল্‌বামই ভরিয়া গিয়াছে। ফরাসী, জার্মানী, ইহুদী, ইংরেজ, জাপানী, বাঙালী, উড়িয়া—কত জাতের কত ঢঙের কি ছবি সব! পুরুষদের লেখা চিঠিতেই যে প্রকৃত রসের সম্ভাবনা—এ বিষয়ে চন্দ্রবাবু নিঃসন্দেহ। মেয়েলী হাতের লেখা চিঠিও মাঝে মাঝে তাক লাগাইয়া দেয় অবশ্য। একবার একটা চিঠিতে ঠোঁটের ছাপ ছিল। রসের কথাও থাকে মাঝে মাঝে। তবু পুরুষের লেখা চিঠির দিকেই চন্দ্রবাবুর ঝোঁক বেশি।

তিন

মেয়েলী হাতের লেখা প্রথম চিঠিখানি খুলিয়া চন্দ্রবাবু হতাশ হইলেন। তবু পড়িতেছিলেন—

"দিদি,

তোমার রিপ্লাই কার্ড গতকল্য পাইলাম। তুমি আমাদের রিপ্লাই কার্ড লেখ, ইহা তোমার পক্ষে লজ্জাকর না হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে আমাদের লজ্জা হয়। তোমার বোঝা উচিত যে, এখানে এখন সব দিক সামলাইবার মত লোক এক আমি ছাড়া আর কেহ নাই। বাবা কিছুই দেখেন না। সমস্ত হাঙ্গামা আমাকে একা পোহাইতে হয়। তা ছাড়া আমার চাকরি আছে। এক মুহূর্ত্ত বিশ্রামের সময় পাই না। তবু তোমার চিঠি পাওয়ার দুই দিন আগেই গদাধরকে স্যাকরার কাছে পাঠাইয়াছিলাম। তোমার গহনা তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে। সাত দিন পূর্ব্বে যখন গিয়াছিলাম, তখন মাত্র কানপাশাটা হইয়াছিল। শনিবার আমার নিজে গিয়া পুনরায় দেখিবার কথা ছিল। কিন্তু আমার মোটে অবসর নাই—স্কুলের প্রাইজ লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত আছি, গার্লস গাইডের সমস্ত ভার আমার উপর। তোমার রসিদটা আমি আজই তালুকদার মহাশয়কে পাঠাইয়া দিতেছি। তুমি তাঁহাকেই চিঠি লিখিয়া গহনা ডেলিভারি লইবার ব্যবস্থা কর। কানপাশাটা আমি দেখিয়াছি, চমৎকার হইয়াছে। অন্যগুলির কথা বলিতে পারিলাম না। দেখিবার সময় নাই। তোমাকে মিনতি করিতেছি, এ রকম কড়া কড়া চিঠি লিখিয়া আমার মন খারাপ করিয়া দিও না।

ইতি—নমিতা"

চন্দ্রবাবু চিঠিখানা একবার শুঁকিলেন। মৃদু আতরের গন্ধ আছে

একটা। চক্ষু বুজিলেন। কল্পনানেত্রে একটি স্ফুরিতাধরা রুষ্টা তরুণীকে দেখিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মানস-পটে অনিবার্য্যভাবে যে ছবিটি বারম্বার ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, তাহা তাঁহার পরিচিত এক শিক্ষয়িত্রীর —গলার সাঁকি বাহির করা, শাঁকচুন্নী-মার্কা শুঁটকো কালো মূর্ত্তি, গলার এবং গালের হাড় উঁচু, খাঁড়ার মত নাক—

মরুকগে।

চন্দ্রবাবু দ্বিতীয় পত্র খুলিলেন।

সাবিত্রীসমানেষু,

তোমার পত্র পাইলাম। তোমরা যদি একটু বুঝিয়া সমঝিয়া না চল, তাহা হইলে এ বাজারে তো আমি গেলাম। চাউলের মণ চল্লিশের ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, দাইলও অগ্নিমূল্য, তরিতরকারি কয়লা সমস্তই তদ্রূপ। সোপস্টোন-মিশ্রিত আটার দাম নীলাম্বর বলিল বারো আনা সের। সরিষার তেল দুই টাকা, ঘৃতের দাম জিজ্ঞাসা করিবার সাহসই হয় নাই। অতি সাধারণ কাপড় দশ টাকা জোড়া। তবু মাসের খরচ যথাসাধ্য কিনিয়াছি। সব নগদ দিতে পারিলাম না, নীলাম্বরের দোকানে অনেক ধার রহিয়া গেল। ধার না করিয়া উপায় কি? নবীনকে কুড়ি টাকা পাঠাইতে হইল। আমি একা আর কত পারি, বল? এমন দুঃসময়ে সায়া কি না পরিলেই নয়? হটাস্ করিয়া এক টাকা গজ মার্কিন ধারে কিনিয়া বসিলে! আমাকে তুমি নবাব খাঞ্জা খাঁ মনে কর নাকি? প্রত্যহ জুতার চোটে চাঁদির চটা উঠাইয়া মনিব আমাকে পাঁচ শতও নয়, হাজারও নয়, মাত্র পঁচাত্তরটি টাকা দেয়, এ কথা তোমাদের কতবার মনে করাইয়া দিব? আমার হাড়-মাস কালি হইয়া গেল যে! অত দাম দিয়া জরদা কিনিবারই বা কি দরকার? বাড়ির পাশে প্রফুল্লর দোকান হইয়া আমাকে ডুবাইবে দেখিতেছি—"

কি আপদ!

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চন্দ্রবাবু পত্রটি খামে পুরিয়া ফেলিলেন। পুরা চার পৃষ্ঠা ধরিয়া ক্ষুদি ক্ষুদি অক্ষরে কেবল ওই এক কথাই লিখিয়াছে লোকটা।

তৃতীয় পত্রটিও পুরুষের হস্তাক্ষর।

ঠিকানায় নাম নীলিমা বসু। খামের রঙ গোলাপী। এ পত্রটিও চন্দ্রবাবুকে হতাশ করিল। নীলিমা পুরুষের নাম।

"নীলিমাবাবু,

আপনি যাইবার সময় দুইটি জিনিস ফেলিয়া গিয়াছেন—হকি-ষ্টিক এবং সিগার-কেস। আপনার ইউরিন পরীক্ষার রিপোর্ট আজ আসিল—এই সঙ্গে পাঠাইতেছি। চার পার্সেণ্ট সুগার আছে। কি সর্ব্বনাশ—"

কচু খেলে যা।

বাজে চিঠি পড়িবার সময় নাই চন্দ্রবাবুর।

চতুর্থ পত্রটি খুলিলেন। এটি বেশ মোটা চিঠি। পুরুষের হস্তাক্ষর। খাম খুলিতেই একটি ছবি বাহির হইল। অদ্ভুত ছবি! নানা রকম পোস্টকার্ডে নানা রকম ছবি তিনি দেখিয়াছেন, কিন্তু ঠিক এ রকমটি কখনও আর চোখে পড়ে নাই। বাঃ! মুগ্ধনেত্রে চন্দ্রবাবু চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার নিষ্প্রভ চোখের দৃষ্টি সহসা যেন জীবন্ত হইয়া উঠিল। ছবি রাখিয়া রুদ্ধশ্বাসে পত্রটি পড়িতে লাগিলেন। বাঃ বাঃ, চমৎকার! এতক্ষণে শ্রম সার্থক হইল। এই তো চিঠির মত চিঠি। বাহাদুর বটে ছোকরা! বাৎস্যায়ন, হাভেলক এলিস, ফ্রয়েড কিছু আর বাকি রাখে নাই। কি ভাষা, কি বর্ণনা! চন্দ্রবাবুর নাসারন্ধ্র স্ফীত হইয়া উঠিল—ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল। একবার, দুইবার, তিনবার তিনি পত্রখানি পড়িলেন। তবু তৃপ্তি হইল না। একবার ইচ্ছা হইল, চিঠিখানা রাখিয়া

দেন ; কিন্তু তখনই আবার মনে হইল, না, সেটা অধর্ম্ম হইবে। রাখিবার দরকার কি? ভাল জায়গাটা টুকিয়া লইলেই হইল। এসব জিনিস টুকিতেও সুখ। মাধুরীকে পড়িয়া শুনাইতে হইবে। মাধুরীর সঙ্গে অবশ্য তিন দিনের আগে দেখা হইবে না ; কিন্তু তিন দিন পরে তো হইবে। ইতিপূর্ব্বে অনেকবার তিনি এই ধরনের চিঠি টুকিয়া মাধুরীকে শুনাইয়াছেন। সহসা মাধুরীর মুখখানা মনের উপর ফুটিয়া উঠিল। মাধুরীটা কেমন যেন! কিছুতেই যেন খুশি হয় না, কাছে গেলে প্যাঁচার মত মুখ করিয়া বসিয়া থাকে। অথচ কি সুন্দর মুখখানি, হাসিলে গালে টোল পড়ে ; কিন্তু কিছুতেই হাসিবে না। যাই হোক, এই চিঠির খানিকটা মাধুরীকে শুনাইতেই হইবে,—দেখি, তাতে কি না এবার!

সাগ্রহে টুকিতে লাগিলেন।

টোকা হইয়া গেলে আদ্যোপান্ত পত্রটি আর একবার পড়িয়া চন্দ্রবাবু সেটি খামে পুরিয়া ফেলিলেন। ছবিটি অবশ্য বাহিরে রহিল।

এইবার পঞ্চম চিঠি।

ঠিকানা ইংরেজীতে টাইপ-করা। নীল খাম।

এ ধরনের চিঠিতে অনেক সময় অপ্রত্যাশিত রকম মজা পাওয়া যায়। অনেক স্বামী টাইপ-করা খাম স্ত্রীকে দিয়া আসেন। টাইপিস্ট ছুঁড়ীগুলাও তাহাদের প্রেমাস্পদকে মাঝে মাঝে চমৎকার চিঠি লেখে। টাইপ-করা ঠিকানায় অনেক ভাল জিনিস মিলিয়াছে অনেকবার।

চন্দ্রবাবু আর এক খিলি পান এবং আর একটু জরদা মুখবিবরে প্রেরণ করিয়া অর্দ্ধস্তিমিত-লোচনে ধীরে ধীরে চোয়াল নাড়িতে লাগিলেন। লালারসে মুখ ভরিয়া উঠিল। জানালা খুলিয়া আর একবার পিক ফেলিলেন। বাস্ রে, কি ভীষণ বিদ্যুৎ হানিতেছে! জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। চতুর্থ চিঠিটা যেন নেশার মত তাঁহাকে পাইয়া

বসিয়াছে। কি সাংঘাতিক বর্ণনা! ইহা পড়িলে মাধুরী এবার নিশ্চয়—

পঞ্চম চিঠিটি খুলিলেন।

"অনঙ্গ,

তুমি আসবে শুনে খুব সুখী হলাম। তোমারই আশাপথ চেয়ে আছি। আমি আর পারছি না। তুমি আমাকে নিয়ে যাও, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, যেখানে হোক নিয়ে যাও। তুমি যেখানে যেমন ভাবে রাখবে, সেইখানেই তেমনি ভাবে থাকব আমি। কেবল এ নরক থেকে উদ্ধার কর আমাকে। তুমি দেরি ক'রো না। বুড়োটা কাল সকালে ডিউটিতে বেরুবে—তিন দিন পরেই ফিরবে আবার। আশা করি, কাল বিকেলে কিংবা পরশু সকালে এসে পড়বে। আমি তৈরি থাকব। আমার অসংখ্য চুম্বন নাও।

ইতি—

তোমারই মাধুরী"

প্রচণ্ড শব্দ করিয়া বাহিরে একটা বজ্র পড়িল।

"বনফুল" লিখিত গ্রন্থাবলী

তৃণখণ্ড	মন্ত্রমুগ্ধ
মৃগয়া	শ্রীমধুসূদন
রাত্রি	বিদ্যাসাগর
কিছুক্ষণ	মধ্যবিত্ত
বৈতরণী-তীরে	কষ্কি
সে ও আমি	বনফুলের কবিতা
নির্মোক	আহবনীয়
দ্বৈরথ	চতুর্দশী
জঙ্গম—তিন খণ্ড	অঙ্গারপর্ণী
বিন্দুবিসর্গ	ভূয়োদর্শন
বাহুল্য	সিনেমার গল্প
বনফুলের গল্প.	রূপান্তর
বনফুলের আরও গল্প	অগ্নি
দশভাণ	অদৃশ্য লোকে
সপ্তর্ষি	স্বপ্ন-সম্ভব